মাওলানা মওদূদীকে (র) যেমন দেখেছি

অধ্যাপক গোলাম আযম

মাওলানা মওদূদীকে (রঃ)
যেমন দেখেছি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৫৪

১ম প্রকাশ-নভেম্বর-১৯৯০ইং

৩য় প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩০
আশ্বিন	১৪১৬
অক্টোবর	২০০৯

বিনিময় ঃ ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MAULANA MAUDUDIKA JAMON DAKHESI by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shrishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 75.00 Only

بسم الله الرحمن الرحيم

মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) যেমন দেখেছি

ইকামাতে দ্বীন ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) অবদান যে কত বিরাট সে কথার বলিষ্ঠ ও বাস্তব সাক্ষী তাঁর রচিত তাফসীর ও বিপুল ইসলামী সাহিত্য। যারা তাঁর রচনা অধ্যয়ন করেছেন তাদের নিকট মাওলানার পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন হয় না। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করার কোন উদ্যোগকেই তিনি পছন্দ করতেন না। মানুষকে আল্লাহর দিকে, দ্বীনের দিকে এবং রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বের দিকে ডাকার কাজই তিনি আজীবন করে গেছেন।

শুধু একটি কারণে মাওলানা সম্পর্কে লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। ইসলামকে যারা অন্তর দিয়ে ভালবাসেন এবং অন্যদেরকেও দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করা ঈমানী দায়িত্ব বলে অনুভব করেন তাদেরকে মাওলানার রচিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য মনে করি। মসজিদের খতীব, ময়দানের ওয়ায়েয, খানকাহর পীর সাহেবানকে হামেশাই জনগণের নিকট দ্বীনের আলো বিতরণ করতে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি যে, তাদের মধ্যে যারা মাওলানার তাফসীর ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের বক্তব্য জনগণের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এর কারণ এটাই যে, আধুনিক যুক্তিবাদী মনের উপযোগী ভাব ও ভাষায় ইসলামকে যেভাবে পরিবেশন করলে ফলপ্রসূ হতে পারে, মাওলানার সাহিত্য সে আর্টই শিক্ষা দেয়।

মাওলানার রচনা অধ্যয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করাই এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্স একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ১৯৮৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমি একটি প্রবন্ধ পেশ করি। "ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান" নামে ঐ প্রবন্ধটি উক্ত একাডেমী কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। মাওলনার সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত কয়েকজন আমাকে আরও কিছু লেখার জন্য তাকীদ দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের পুরনো সহকর্মী জনাব নূরুজ্জামানের অব্যাহত চাপের ফলেই পুস্তিকাটির রচনা ত্বরান্বিত হলো। এ শিরোনামে মওদূদী একাডেমী একটি প্রশ্নমালা তৈরী করে এর জওয়াব লেখার জন্য ডাইরেক্টর মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমও জোর

তাকীদ দিতে থাকেন। নব রচিত পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে বলে মওদূদী একাডেমীর প্রকাশিত প্রবন্ধটিও শেষাংশে সংযোজন করা হলো। যে আশা নিয়ে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তা আল্লাহ্ পাক পূরণ করুন—এ দোয়াই করছি।

রবিউল আউয়াল, ১৪১১
অক্টোবর, ১৯৯০
আশ্বিন, ১৩৯৭

গোলাম আযম
মগবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

❑ মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) যেমন দেখেছি ---------- ১১
আমার দ্বীনি জীবন ---------- ১২
ইসলামী জ্ঞানের অদম্য পিপাসা ---------- ১৪
এ ভালবাসা অন্ধ নয় ---------- ১৬
মাওলানার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ---------- ১৬
মাওলানার চেহারা ---------- ১৯
মাওলানার সুহবতের সুযোগ ---------- ১৯

❑ মাওলানার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ---------- ২২
ইসলামী চিন্তাবিদ ---------- ২২
ইসলামী সংগঠক ---------- ২২
আমি দুটো কারণে চিন্তাবিদ মওদূদীর চেয়ে সংগঠক
মওদূদীকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি ---------- ২৪
ইসলামী আন্দোলনের নেতা ---------- ২৫
রাজনীতিবিদ মওদূদী ---------- ২৫
সংস্কারক মওদূদী ---------- ২৭
আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ---------- ২৮
আলেমে দ্বীন হিসেবে ---------- ২৯
মাওলানার দারস ও বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ---------- ২৯
আমার কতক প্রশ্নের জওয়াব ---------- ৩২
ইসলামী আন্দোলনের ধারণা কোথায় পেলেন ? ---------- ৩৩
তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে ---------- ৩৮
একটি হাদীসের ব্যাখ্যা ---------- ৪১
কতক আলেমের জামায়াত ত্যাগ প্রসংগে ---------- ৪২
মাওলানার বিরুদ্ধে ফতোয়ার হাকীকত ---------- ৪৩
আমার এ অভিজ্ঞতার দু' একজন সাক্ষীর কথা উল্লেখ করছি ---------- ৪৫
মাওলানার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ---------- ৪৮
লাহোর জেলে দু' মাস ---------- ৫৪
মাওলানার নির্ভিকতা ---------- ৫৭
মাওলানার দূরদর্শিতা ---------- ৬১
মাওলানার সূক্ষ্মদর্শিতা ---------- ৬২

মাওলানার জীবনে শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ---------- ৬৪
মাওলানার মেজায ---------- ৬৫
হালকা রসিকতার নমুনা ---------- ৬৭
মাওলানার খাদ্যাভ্যাস ---------- ৬৯
মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর ---------- ৭০
দু'জনের সাথে মাওলানার উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ---------- ৭৩
মাওলানার লেখা সাহিত্য অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা ---------- ৭৬
মাওলানার পেছনে নামায আদায় ---------- ৭৭
আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সাথে ---------- ৭৮

☐ ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) অবদান ---------- ৮১
ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন ---------- ৮২
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ---------- ৮২
মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ ? ---------- ৮৪
মাওলানা মওদূদীর যুগ ---------- ৮৫
মাওলানার অবদান ---------- ৮৬
উপসংহার ---------- ১০৩
আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ ---------- ১০৩

মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) যেমন দেখেছি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে আমি আন্তরিকভাবে অত্যন্ত আবেগের সাথে মহব্বত করি। এ মহব্বত যে কত গভীর তা ভাষায় প্রকাশের সাধ্য আমার নেই। আমার জীবনে যত মানুষের সাথে সরাসরি দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ ও মিলা মিশার সুযোগ হয়েছে তাদের মধ্যে যার প্রতি আমি সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয়েছি, যাকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি এবং যার নাম শুনলে অন্তরে গভীর আবেগ বোধ করি তিনিই মাওলানা মওদূদী (রঃ)।

কোন ব্যক্তির জন্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা বোধ বিনা কারণে সৃষ্টি হয় না। পিতার জন্য শ্রদ্ধা ও মায়ের জন্য ভালবাসা বোধ করার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। তাঁদের স্নেহ-মমতা, সন্তানের কল্যাণের জন্য তাদের অবিরাম নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও তাঁদের অগণিত অবদানের ফসল থেকে বাস্তবে যেসব সুখ-সুবিধা ভোগ করা যায় সে কারণে তাঁদের প্রতি মনে গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ জাগে। ঐ শুকরিয়ার অনুভূতি থেকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি জন্ম নেয়।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসাও তাঁর অসীম মেহেরবানীর প্রতি শুকরিয়া বোধেরই সৃষ্টি। তাঁর করুণা সম্পর্কে যে পরিমাণ ধারণা জন্মে শুকরিয়ার ভাব সে পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার অনুভূতিও সে হিসাবেই গভীর হতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালার অগণিত অনুগ্রহের মধ্যে দ্বীনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আর কুরআন মজীদই ঐ দ্বীনের প্রধান উৎস। সূরা আর রাহমানের পয়লা আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা করেছেন "আর রাহমান, আল্লামাল কুরআন।" অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা দেয়াটাই তাঁর আর রাহমান হওয়ার বড় প্রমাণ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ কুরআনেরই জীবন্ত বাস্তব রূপ। মানুষের যে প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে তা একমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমেই সত্যিকারভাবে পূরণ হয়েছে। এ কারণেই রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি যে পরিমাণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা মু'মিনের দিলে পয়দা হয় এমন গভীর ভালবাসা আর কোন মানুষের জন্যে হতেই পারে না। ঐ একই কারণে আমরা সবচেয়ে বেশী রাসূল (সাঃ)-এর পর সাহাবায়ে কেরামের

প্রতি ভালবাসা বোধ করি। এমনি ক্রম অনুযায়ী তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের ইমামগণকে আমরা দ্বীনের কারণেই ভালবাসি।

এটাই স্বাভাবিক যে, যার কাছ থেকে দ্বীনের ব্যাপারে যত বেশী উপকার লাভ করা যায় তাঁর জন্য তত বেশী মহব্বত লাগে। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে ভালবাসার আসল কারণ দ্বীন। আমার দ্বীনি জিন্দেগী গঠনে যে কয়জনের প্রত্যক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) স্থান সর্বোচ্চে। মাওলানা মরহুমের ব্যাপারে আমার এ মূল্যায়নকে উপলব্ধি করার জন্য আমার দ্বীনি জীবনের ক্রমবিকাশের সামান্য ইংগিত দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি। আশা করি এটাকে কেউ অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না।

আমার দ্বীনি জীবন

আমার পরম স্নেহপরায়ণ দাদা মাওলানা আবদুস সুবহান সাহেবের বড় নাতি হবার কারণে আমি বাল্যকালে পিতার চেয়ে দাদার মহব্বতই বেশী পেয়েছি। মক্তবের কারী সাহেবের চেয়ে বেশী তিনিই আমাকে কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। অযু, গোসল, খাওয়া-দাওয়া, এমন কি খেলার সময়ও তিনিই সাথী ছিলেন।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আমাকে দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়াতে চাইলেন। দাদা আমাকে নিউস্কীম মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় পড়লে বাংলা, ইংরেজী শেখা হয় না। আর হাইস্কুলে পড়লে আরবী শেখা যায় না বলে তিনি এ ব্যবস্থা করলেন। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন দাদা ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তিনি দ্বীনের প্রতি যে আগ্রহ ও দৈনন্দিন জীবনে যে অভ্যাস গড়ে তুললেন তাই আমার প্রাথমিক পুঁজি বলে প্রমাণিত হলো। তিনিই আমার প্রথম দ্বীনি ওস্তাদ, যদিও তখন সে কথা সচেতনভাবে বুঝতে পারিনি।

সচেতনভাবে যার জন্য পয়লা আমার দ্বীনি ওস্তাদ বলে মহব্বত বোধ করেছি তিনি হলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)। তখন আমি কুমিল্লা হুসামিয়া হাই মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। মাসিক নেয়ামত নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দ্বীনি পত্রিকায় থানভী মরহুমের ওয়াযের বাংলা অনুবাদ ছাপা হতো। থানভী (রঃ)-কে দেখার সৌভাগ্য না হলেও তাঁর ওয়ায আমাকে মুগ্ধ করতে লাগল। কুরআন ও হাদীসের কথাকে এমন চমৎকার যুক্তি দিয়ে তিনি পেশ করতেন যে, ইসলামকে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ 'ধর্ম' বলে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। কুরআন হাদীসের 'নকলী' দলীলকে

'আকলী' দলীল দ্বারা পরিবেশন করার এ মহান শিল্পের (আর্টের) সন্ধান আমি পয়লা তাঁর কাছ থেকেই পাই।

১৯৪০ সালে ঢাকায় সরকারী ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ) নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর মাসিক নেয়ামত পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হলাম। থানভী (রঃ)-এর লেখা বইয়ের বাংলা অনুবাদক হিসাবে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর সাথে যোগাযোগ হয়। ছাত্র জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা চলতে থাকে।

এম, এ ফাইনাল পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে আমার আব্বার নির্দেশ ও আগ্রহে তাবলীগ জামায়াতের সাথে সম্পর্ক হয়। থানভী (রঃ)-এর পরিবেশিত যুক্তিপূর্ণ ইসলাম ধর্মকে বাস্তব জীবনে পালন করার যে পদ্ধতি সেখানে পেলাম তা আমাকে এতটা আকৃষ্ট করল যে, পরীক্ষার পরপরই চার মাসের জন্য (তিনচিল্লা) তাবলীগ জামায়াতের সাথে এদেশে ও ভারতে সফরে বের হলাম। চার বছর তাবলীগ জামায়াতে নিয়মিত কাজ করেছি এবং ৮/১০টি চিল্লা দেবার সৌভাগ্য হয়েছে।

আমার জীবনে তাবলীগ জামায়াতের মহান অবদানকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। আল্লাহর দ্বীনের জন্য গোটা জীবনকে নিয়োজিত করতে হবে —এ প্রেরণা এ জামায়াতেরই বড় অবদান। তাবলীগী চিল্লায় থাকা কালেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কলেজে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেই দ্বীনের কাজে বেশী সময় খরচ করা সম্ভব হবে।

১৯৫০ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপনা শুরু করার সাথে সাথে রংপুর শহরে তাবলীগ জামায়াতের কাজ চালু করা সম্ভব হল। ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের মরহুম সুলায়মান ভাই তমদ্দুন মজলিশের দাওয়াত নিয়ে আমার কাছে হাযীর হন।

জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলার যে ওয়াদা কালেমা তাইয়েবায় করেছি সে কথা তাবলীগ জামায়াতে মুখস্ত করা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা কী তা জানা যে মুসলিম হিসাবে বিরাট কর্তব্য সে যুক্তি অস্বীকার করা গেল না। তমদ্দুন মজলিশের কাজও আমার মাধ্যমেই রংপুরে শুরু হয়ে গেল।

দু'বছর আমি একই সাথে তাবলীগ জামায়াতের আমীর ও তমদ্দুন মজলিশের সংগঠনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম। ১৯৫৩ সালের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তমদ্দুন মজলিশের কয়েকদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ইসলামী সম্মেলন এবং ঐ বছরই রমযান মাসে চুয়াডাংগা হাইস্কুলে মজলিশ আয়োজিত ১৫ দিন ব্যাপী উন্নত শিক্ষাশিবির ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে বুঝতে সাহায্য করেছে।

তাবলীগ জামায়াতে ইসলামের ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুন মজলিশে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের চর্চার মাধ্যমে আমি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সন্ধান করছিলাম। তাবলীগ জামায়াতে ধর্ম চর্চার সুযোগ পাওয়ায় আমার মধ্যে ধর্মীয় কর্তব্যের মান সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তমদ্দুন মজলিশের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে বেশ কিছু অভাব বোধ করতাম। নেতৃবৃন্দের সাথে এ নিয়ে তর্কও করতাম। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লব সম্বন্ধে তমদ্দুন মজলিশের যে অবদান আমার চিন্তা-চেতনায় মযবুত আসন গেড়ে বসেছে তাতে শুধু তাবলীগ জামায়াতের দ্বারা ইসলামের দাবী পূরণ হতে পারে না বলে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। তাই পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাবী পূরণের প্রয়োজনেই এ উভয় সংগঠন প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম। উভয় সংগঠনের স্থানীয় প্রধান দায়িত্ব আমার উপর থাকায় কোনো সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী জ্ঞানের অদম্য পিপাসা

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রঃ) চিন্তাধারা ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের যে পিপাসা আমার অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছিল তার ফলে আমি কুরআনকে সরাসরি বুঝবার চেষ্টা করতে বাধ্য হলাম। বাংলা ও ইংরেজীতে তখন যে কয়টি তাফসীর পেলাম তা অধ্যয়ন করতে গিয়ে অনুভব করলাম যে, আমার পক্ষে কুরআন আয়ত্ব করা অসম্ভব। তাই কুরআনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রচিত ইসলামী বই পুস্তকের মাধ্যমেই কুরআনকে বুঝতে চাইলাম। উর্দু ভাষায় তখন দখল না থাকায় বাংলা ও ইংরেজীতে এ ব্যাপারে এগুতে পারলাম না। কুরআন বুঝবার তীব্র আকাংখা অন্তরেই গুমরে মরতে লাগল। তাবলীগ জামায়াতে কুরআন অধ্যয়নের তাকীদ দূরের কথা, সেখানে কুরআন চর্চার সামান্য ইংগিতও দেখিনি।

তাবলীগ জামায়াত গোটা জীবনকে দ্বীনের পথে নিয়োজিত করার প্রেরণা সৃষ্টি করল বটে কিন্তু এ সংগঠনের কর্মসূচী আমার নিকট যথেষ্ট মনে হলো না। তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী বিপ্লবের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করলো

তাতে তাবলীগী প্রোগ্রামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহ পেলাম না। কিন্তু এ জীবন যে ইসলামের জন্যই খরচ করতে হবে তাবলীগ জামায়াত থেকে পাওয়া এ জযবা সে পথই তালাশ করতে থাকল।

তমদ্দুন মজলিশ আমার মধ্যে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবের যে প্রেরণা সৃষ্টি করল তার ফলে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোসহ ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে জ্ঞানের পিপাসা তীব্র হয়ে উঠল। তমদ্দুন মজলিশের নেতৃবৃন্দকে ইসলামের ব্যাপারে অত্যন্ত মুখলিস পেয়ে তাদের জ্ঞান থেকেও সাধ্যমতো সে পিপাসা মিটাবার চেষ্টা করলাম। তারাও যে আমারই মতো সত্য সন্ধানী ও জ্ঞান পিপাসী তা উপলব্ধি করলাম। মাওলানা মওদূদীর (রঃ) লেখা "POLITICAL THEORY OF ISLAM" বইটি সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিশ থেকেই পেয়েছিলাম। এ থেকে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত স্বচ্ছ ধারণা পেলেও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়ায় এ বিষয়ে জানার আগ্রহ আরও তীব্র হলো।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তখন আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তমদ্দুন মজলিশে এ বিষয়ে যতটুকু চর্চা হতো তা থেকে ব্যক্তি মালিকানা ইসলাম বিরোধী বলে ধারণা দেয়া হলো। কিন্তু কুরআন সম্পর্কে সামান্য যতটুকু জ্ঞান আমার ছিল তাতে এ ধারণা সঠিক বলে মন মেনে নিতে পারছিল না। কার্জন হলে অনুষ্ঠিত যে ইসলামী সম্মেলনের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেখানে অর্থনীতির এক অধ্যাপক এ বিষয়ে প্রধান বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ছিল। এর শিরোনাম ছিল মার্কসবাদ যোগ আল্লাহ্ = ইসলাম। নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বুঝলাম যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তখনও সুস্পষ্ট কাঠামো গড়ে উঠেনি, গবেষণার বিষয় হয়েই আছে। এভাবে তমদ্দুন মজলিশ আমার মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়ে দিল। জ্ঞানের পিপাসা না মিটলেও তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে জানতে পারলাম।

এভাবে ইসলামী চিন্তাধারা নির্মাণে মাওলানা থানভী (রঃ) তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিশ জ্ঞানগত দিক দিয়ে যে পরিমাণ অবদান রেখেছে তার চেয়ে অনেক বেশী পিপাসা সৃষ্টি করেছে। এটাকেও আমি বিরাট অবদান মনে করি। এ পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিল বলেই মাওলানা মওদূদীর (রঃ) তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" অধ্যয়নের জন্য উর্দু ভাষা আয়ত্ব করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের সময় মাওলানা মওদূদীর (রঃ) খুব কম বই-ই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। "তাফহীমুল কুরআন" অধ্যয়ন উপলক্ষে উর্দু শেখার সৌভাগ্য হওয়ায় মাওলানা মওদূদীর (রঃ) রচিত বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার মন্থন করার সুযোগ পেলাম। চৈত্র মাসের শুকনো জমি বৃষ্টির পানি যেভাবে শুষে নেয় আমার তৃষ্ণার্ত প্রাণ তেমনি তৃপ্তির সাথে জ্ঞানসুধা পান করতে লাগল। মনে হলো ইসলামের যাবতীয় ধনরত্ন এখান থেকেই লাভ করা যাবে।

ইসলামের ধর্মীয় দিক থেকে আরম্ভ করে অর্থাৎ কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত থেকে নিয়ে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক বিষয়, এমন কি আখিরাতের মুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও এমন স্বচ্ছ সাবলীল ধারণা পেলাম, যা আমাকে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করল। আমার মনে হলো যেন আমি মহা সম্পদের সন্ধান পেলাম।

যার রচিত সাহিত্য ও যার গঠিত সংগঠন আমাকে জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পথের দিশা দিতে সক্ষম হল তাঁকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে ও ভালবাসতে মন চাইতে পারে সে বিষয়ে ধারণা দেবার জন্যই আমার দ্বীনি জিন্দেগী গঠনের ক্রমবিকাশের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম।

এ ভালবাসা অন্ধ নয়

মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) এত গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁকে কখনো আমি নির্ভুল মনে করি না। রাসূল ছাড়া যে কোন মানুষই ভুলের উর্ধে নয় সেকথা তাঁর তাফসীর, সাহিত্য ও জামায়াতের গঠনতন্ত্রের আকীদা সম্পর্কিত ধারায় সুস্পষ্ট। তাই কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতেই তাঁর রচনার মূল্যায়ণ করে থাকি।

এ পুস্তিকায় তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করতে চাই তাতে ভক্তির আতিশয্যে বা ভালবাসার আবেগে কোন কথা বাড়িয়ে বলার আশংকা নেই। "মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) যেমন দেখেছি" এ পর্যায়ে আমি খুবই সতর্কতার সাথে আলোচনা করছি যাতে তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পরিবেশন করতে পারি।

মাওলানার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

মাওলানার সাথে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে লাহোরে পয়লা সাক্ষাৎ হয়। এর আগে তাঁর কোন ফটোও দেখিনি। দেখার আগেই তাঁর প্রতি ভালবাসা

গভীর হওয়ার কারণে তাঁকে দেখার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক ছিল। ঐ বছরই ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে রংপুর জেলে "তাফহীমুল কুরআন" অধ্যয়নে মগ্ন থাকা কালে আমার মনে হতো যেন মাওলানা আমার কাছেই দেয়ালের আড়ালে আছেন। কারণ সে সময় তিনিও লাহোর জেলে ছিলেন।

১৯৫৩ সালে তাঁকে সামরিক আইনে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়। যে 'কাদিয়ানী সমস্যা' বইটি লেখার দোষে তাঁকে ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সে বইটিকে কিন্তু কোন সময় বেআইনী করা হয়নি। তখন গোলাম মুহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যেই মাওলানাকে এক উপলক্ষে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ৬০টি দেশ থেকে এর প্রতিবাদ করায় মৃত্যু দণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। সে দণ্ডের মেয়াদই তিনি তখন ভোগ করছিলেন। কিন্তু যে আইন বলে তাকে আটক রাখা হয় সুপ্রিম কোর্টের কোন এক মামলার রায়ের ফলে সে আইনটি বাতিল হওয়ায় তিনি মুক্তি পান।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় গোলাম মুহাম্মদ নির্বাচিত গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে মনোনীত গণপরিষদ দ্বারা মনগড়া শাসনতন্ত্র রচনার ষড়যন্ত্র করে। গণ-পরিষদের সভাপতি মৌলভী তমীজুদ্দীন খান এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করেন। কোর্টের রায় অনুযায়ী নতুন করে গণপরিষদ নির্বাচিত হয়। গণ-পরিষদ সদস্যদের ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থক বানাবার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী যে টীম গঠন করেছিল এর অন্যতম সদস্য হিসাবেই আমার পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার সুযোগ হয় এবং মাওলানার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি আমার চোখে এখনও ভাসে। হৃদয়ভরা আবেগ নিয়ে যখন দেখা করতে এগিয়ে যাই তখন মনে প্রবল সমীহ সৃষ্টি হয়। এত বড় চিন্তাবিদ, মনীষী ও ব্যক্তিত্বের সামনে আর কখনও হাযীর হইনি। তাঁর বৈঠকখানার দরজায় পা দিতেই প্রশস্ত চেহারা ও বড় বড় দুটো চোখ দেখে একটু দমে গেলাম। মৃদু স্বরে আসসালামু আলাইকুম বলে সম্বোধন করলাম। তিনি মৃদু মিষ্টি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সংকুচিত হয়েই মুসাফাহা করলাম। ইশারা করে তার সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। সংকোচের সাথেই বসলাম। আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহূর্তের মধ্যে সংকোচ দূর হয়ে গেল। তাঁর স্নেহভরা দৃষ্টি ও আপন করার মতো মিষ্টি ভাষায় মনে

হলো যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যেন পিতা পুত্রের মিলন ঘটেছে। এমন সহজ সরল মানুষকে সমীহ্ করে নিজের অন্তরেই লজ্জা বোধ করলাম। নেতা হিসাবে সামান্য কৃত্রিমতাও তাঁর আচরণে টের পাওয়া গেল না। যা কিছু আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন সহজভাবে জওয়াব দিতে থাকলাম। তৃপ্তিতে মনপ্রাণ ভরে গেল।

যে লোকটি ফাঁসির হুকুমকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল রাখে, ক্ষমা চাওয়ার সরকারী অনুগ্রহকে একথা বলে উড়িয়ে দিতে পারে যে, "স্বাভাবিক মৃত্যু হলে এ ইয়াকীন নিয়ে মরা যায় না যে আমি শহীদ হচ্ছি। আমার আল্লাহ যদি আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করার ফায়সালা করে থাকেন তাহলে খুশী মনে আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আমি কি সরকারের নিকট দরখাস্ত করব যে আমাকে শহীদ হওয়া থেকে বাঁচাও ?" এমন বলিষ্ঠ চিত্তের লোকটির সাথে কথা বলে মনে হিম্মত বাড়ল।

মৃত্যুভয়ই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা ও চরম সংকটপূর্ণ সময়ও পেরেশান না হওয়া, এমনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও ধীর চিত্তে সিদ্ধান্ত নেবার যেসব বিবরণ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামের সংগ্রামী ইমামদের জীবনীতে পড়েছি তার নমুনা এ যুগেও পাওয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। ইতিহাসে ঐ সব ঘটনা পড়ে বা এ বিষয়ে বক্তৃতা শুনে ঐ মহাপুরুষদের প্রতি যতই শ্রদ্ধা বোধ করেছি না কেন, এ দ্বারা আমার অন্তর থেকে মৃত্যুভয় দূর হয়েছে বলে কখনও অনুভব করিনি।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখ রংপুর কলেজ ক্যাম্পাসে আমার বাসায় লাহোর থেকে প্রকাশিত জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'তাসনীম পত্রিকার "ইখওয়ান সংখ্যা" পড়ছিলাম। শেষ না করে শুতে যেতে পারছিলাম না। মিশরে ১৯৫৩ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের যে কয়জন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয় তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কী কী ভাষায় "জীবনের জয়গান" গেয়ে গেলেন তারই বিবরণ পড়ছিলাম। মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) ফাঁসির হুকুম শুনাবার পর বিভিন্ন সময় তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে ঐ সুরই ধ্বনিত হয়েছে। ঐ সংখ্যাটিতে সে কথাগুলোও পড়ছিলাম।

পড়া শেষ হলে ধীর চিত্তে ভাবলাম যে আমিও তো ইসলামী আন্দোলনের ঐ কঠিন ও বন্ধুর পথেই পা দিয়েছি। ফাঁসির রজ্জু আমার গলায়ও পৌছতে পারে। আনমনেই ডান হাতে গলা স্পর্শ করে দেখলাম কোনখানটায় ফাঁসির রশি লাগতে পারে।

রাত তখন বারটার বেশী। মনে অদ্ভুত বলিষ্ঠতা বোধ করলাম। আমিও হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে পারব বলে অনুভব করলাম। এক অনাবিল প্রশান্তিতে অন্তর ছেয়ে গেল। এরপর থেকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির ভয় হৃদয়ে স্থান পায়নি। শুধু অতীত ইতিহাসের কাহিনী এমন ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। এ যুগেও যে এটা সম্ভব তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়ার কারণেই এ বলিষ্ঠতা বোধ করতে সক্ষম হয়েছি। এ কারণেই কোনো যুগেই সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া আন্দোলন সফল হয়নি।

ঘটনাক্রমে পরদিন সকালে (৬ ফেব্রুয়ারী, ৫৫) নিরাপত্তা আইন বলে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। মনে এক অভূতপূর্ব স্বাদ বোধ করলাম যা ইতিপূর্বে ভাষা আন্দোলনের কারণে ৪৮ সাল ও ৫২ সালে গ্রেফতার হবার সময় করিনি।

মাওলানার চেহারা

তিনি লম্বা ছিলেন না। তেমন খাটও ছিলেন না। পরিপুষ্ট দেহের অধিকারী চমৎকার সুপুরুষই ছিলেন। লালচে সাদা রং-এর প্রশস্ত চেহারা বড়ই আকর্ষণীয় ছিল। চেয়ে থাকতেই মন চাইত। এমন সুন্দর মানানসই দাড়ি কমই দেখা যায়। বড় বড় দুটো চোখ চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। চশমায় চমৎকার মানাতো।

তিনি সৈয়দ বংশের লোক। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৩৭তম ঊর্ধতম পুরুষ। সীরাতের বইতে রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মুবারকের যে বর্ণনা পড়েছি তার সাথে যতটুকু মিল মাওলানার চেহারায় পেয়েছি বলে আমার মনে হয়েছে এতটা মিল আর কারো চেহারায় দেখিনি।

কথায় বলে, যাকে ভালবাসা যায় তার সবকিছুই ভাল লাগে বা ভাল মনে হয়। একথা খেয়াল রেখেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যক্তিগত অভ্যাস, আচার আচরণ, বলার ভংগী, চলার ধরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁর বৈঠকখানার অনাড়ম্বর সাজ, তাঁর গোছানো টেবিল ইত্যাদির কোনটাকেই চমৎকার ও সুন্দর বলে স্বীকার না করে পারা যায় না।

মাওলানার সুহবতের সুযোগ

আল্লাহ পাক আমাকে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার বহু সুযোগ দান করেছেন।

১ ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় দেড় মাস তিনি পূর্ব পাকিস্তানে পয়লা সফর করেন। প্রায় সব জিলা শহরেই তিনি জনসভা ও সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বৈঠকী আলোচনায় উপস্থিত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। তিনি উর্দুতে বলার দরুন এর বাংলায় অনুবাদ করতে হতো এবং এ দায়িত্বটা পালন করার সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল। ফলে প্রায় গোটা সফরেই তাঁর সংগী হবার সুযোগ হলো। ট্রেনে, ষ্টীমারে ও কারে আমি তাঁর সাথেই থাকতাম। পাঁচ ওয়াক্তের নামায, সকাল বিকাল নাস্তা, দু'বেলা খাওয়া একই সাথে হতো। তাঁর শোবার ঘর ও বসার ঘরে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। বিশিষ্ট লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বও পালন করতে হতো।

তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপর থাকায় তাঁর সব কথাই আমাকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হতো এবং এর জন্য তাঁর কাছেই থাকতে হতো। তাঁর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই দু বছর যথেষ্ট পড়া সত্ত্বেও ৪০ দিনের এ সফরে তাঁর সুহবতে থেকে মনে হলো যে, এ অল্প সময়ে ইসলামকে ঐ দু' বছরের তুলনায় অনেক বেশী স্বচ্ছভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছি।

এতে বুঝা গেল যে, শুধু কিতাবই যথেষ্ট নয়; কিতাব বুঝবার জন্য মানুষের সাহচর্যও জরুরী। তাই আল্লাহ তায়ালা কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন। শুধু রাসূল বা শুধু কিতাব যথেষ্ট মনে করা হয়নি।

২ এরপর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৫/৬বার সফর করেছেন এবং প্রত্যেকবারই আমি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানেও কয়েকবার তার সাথে সফর করার সুযোগ পেয়েছি।

৩ তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে আমেলা ও মজলিশে শুরার অধিবেশনসমূহে তাঁর মধ্যে যে সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, জ্ঞানের গভীরতা, নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা, বিতর্ক নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেকনিক ইত্যাদি লক্ষ্য করেছি তা আন্দোলনের জীবনে মূল্যবান পাথেয় হয়ে রয়েছে।

৪ বিভিন্ন সময় ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, রাজনৈতিক সমস্যা, কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা, কোন হাদীসের ব্যাপারে খটকা ইত্যাদি নিয়ে আমার মনে যত প্রশ্ন সৃষ্টি হতো তার জওয়াবের জন্য সময় চাইলে তিনি দিতেন। তবে বেশীর ভাগ প্রশ্নই চলাফেরা, উঠাবসা ও খাওয়া-দাওয়ার সময় সুযোগ মতো জিজ্ঞেস করে নিতাম।

[৫] একটানা দু'মাস তাঁর যে ঘনিষ্ঠ সুহবত ১৯৬৪ সালে লাহোর জেলে পেয়েছিলাম এর স্মৃতি চির অম্লান থাকবে। তাঁর পাশের রুমেই আমি ছিলাম। একসাথে নামায, নাস্তা, খাওয়া, রমযানে তারাবীহ, ইফতার, সেহরী, একবেলা তাঁর দারসে কুরআন ও আর একবেলা দারসে হাদীস জেল জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়ে দিত। প্রথম দিকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলেও মাওলানার সুহবতে যে ফায়দা পাচ্ছিলাম তার কারণে ওখানে জেলে আটক থাকাকে আল্লাহর এক মহা নিয়ামতই মনে করতাম।

মাওলানার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

একজন মনীষী কোনো একদিকে প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে অনেক গুণেরই সমাবেশ হয়ে থাকে। যদিও সর্বক্ষেত্রে হয়তো এতটা উল্লেখযোগ্য নন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রঃ) অনেক দিক দিয়েই প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যতগুলো গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছে এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এমন অনন্য যে তিনি সর্বক্ষেত্রেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী চিন্তাবিদ

একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি এ শতাব্দির সেরা ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডক্টর মুহাম্মদ কুতুব লণ্ডনে ১৯৭৪ সালে মাওলানার সম্বর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বলেন, "দুনিয়ার সব দেশে এবং সব কালেই ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়ে থাকে। এ যুগেও ইসলামী চিন্তাবিদের অভাব নেই। কিন্তু এ শতাব্দিতে মাওলানা মওদূদীর চেয়ে বড় কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়নি। চিন্তার স্বচ্ছতা, পরিবেশনার পরিচ্ছন্নতা, আলোচ্য বিষয়ের বিস্ময়কর গ্রন্থনা ও অল্প কথায় আসল বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি চমৎকার ভাষায় আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তি দিয়ে সংক্ষেপে ও ধারাবাহিকভাবে ইসলামকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

ইসলামী সংগঠক

দুনিয়ার সব ইসলামী চিন্তাবিদই কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবন থেকে ইসলামকে বুঝেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রায় একই বলা যায়। অবশ্য পরিবেশন করার যোগ্যতা ও দক্ষতা সবার সমান নয়। এদিক দিয়ে মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বলে স্বীকার করা হয়।

ইসলামী সংগঠক হিসাবে আমার বিবেচনায় তিনি অতুলনীয়। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে যা লিখেছেন তার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট। কিন্তু সংগঠক হিসাবে তিনি যত ব্যাপক বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন তার জন্য এতটা স্পষ্ট ভিত্তি লিখিত আকারে কোথাও রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জামায়াতও এলাকার ভিত্তিতে দুটো সংগঠনের রূপ লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ায় এদেশেও সংগঠনের নিজস্ব কাঠামো গড়ে ওঠে। "জামায়াতে ইসলামী" নামে উপ-মহাদেশে যে দেশে সংগঠন রয়েছে সর্বত্রই ঐসব সাংগঠনিক বিধি-বিধান চালু রয়েছে যা মাওলানা মওদূদী (রঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত বিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। সংগঠনের কোন পর্যায়েই নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারবে না।

২। কেউ পদের আকাংখী হলে অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৩। নির্বাচিত নেতা যাতে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারে সেজন্য নির্বাচিত মাজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে চলতে হবে।

৪। সংগঠনের সর্বস্তরে নেতা নিজেই মাজলিসে শূরা ও সদস্য সম্মেলনে নিজকে সমালোচনার জন্য পেশ করবেন এবং তাঁকে সংশোধন করার সুযোগ দেবেন।

৫। সংগঠনে কোন উপদল সৃষ্টি করার অধিকার কারো নেই।

৬। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অবাধে মতামত প্রকাশ করবেন। কোন বিশেষ মতের পক্ষে গ্রুপ হিসাবে কোন ভূমিকা পালন করা চলবে না।

৭। মাজলিসে শূরার অধিবেশনে ও সদস্যদের বৈঠক বা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যাতে সবাই একমত হয়।

৮। যদি কোন বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে ভিন্ন মত পোষণকারীগণ ঐ সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন এবং এর বিরুদ্ধে বাইরে কোথাও নিজের মত প্রকাশ করবেন না।

৯। সংগঠনের সকল সদস্যই দায়িত্বশীলদের নিকট প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠাতে পারবেন এবং নিজেদের ভিন্ন কোন মত থাকলেও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

১০। সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ সদস্যদের নিকট তাদের কার্যাবলীর ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

সংগঠনকে সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত রাখা, নেতৃত্বের কোন্দল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশংকা রোধ করা এবং উপদলীয় সংঘাত ও মতবিরোধের সকল পথ বন্ধ করার এমন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকায় উপমহাদেশে জামায়াতের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা আর সব দলের মধ্যে

অহরহই ঘটে চলেছে। এ কারণেই আমার দৃষ্টিতে সংগঠক মওদূদী এক বিরল প্রতিভা। সংগঠনকে গড়ে তোলা, মজবুত করা, বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা, নেতৃত্বের কোন্দল থেকে বাঁচিয়ে রাখা—এক কথায় সংগঠনকে সকল অবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখার জন্য তিনি এমন চমৎকার বিজ্ঞান সম্মতপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা আমাকে বিস্মিত করেছে। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে আমি কয়েকটি ইসলামী সংগঠনে কয়েক বছর কাজ করার ফলে সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে তাঁর গঠিত সংগঠনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের তুলনা করা আমার জন্য সহজ হয়েছে। ৭ বছর বিদেশে থাকাকালে বিভিন্ন দেশের ইসলামী সংগঠনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানারও সুযোগ পেয়েছি। এ কারণেই সংগঠক হিসাবে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী গঠনের সূচনা থেকেই এর যেসব কার্য-বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়েছে তাতে জামায়াতের আমীর হিসাবে এবং মাজলিসে শুরার ও রুকন সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাঁর যেসব সাংগঠনিক বক্তব্য রয়েছে তা এ বিষয়ে তাঁর অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত কর্মসূচী, হেদায়াত ইত্যাদি পুস্তক তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতার বলিষ্ঠ সাক্ষী। মাজলিশে শূরা ও আলোচনার সভাপতি হিসাবে ১৯৫৫ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত আমি তাঁর সাংগঠনিক মনীষার যে অতুলনীয় প্রমাণ পেয়েছি তা আমাকে রীতিমতো মুগ্ধ করেছে।

আমি দু'টো কারণে চিন্তাবিদ মওদূদীর (রঃ) চেয়ে সংগঠক মওদূদীকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি

১ কুরআন-হাদীস ও বিশ্বের বিপুল ইসলামী সাহিত্য তাঁকে চিন্তাবিদ হওয়ার ব্যাপারে যেভাবে সরাসরি জ্ঞান দান করেছে, সংগঠক হওয়ার জন্য কোন সাহিত্য তাঁকে তেমন আলো দিতে পেরেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যুগে যুগে যে পরিমাণে ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়েছে, সে পরিমাণে সংগঠক পয়দা হয়েছে বলে মনে হয় না। সংগঠন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যে পূর্ণাংগ বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার ফলে তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাবার পরও তাঁর গঠিত সংগঠনে সামান্য কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। তিনি ব্যক্তি-নির্ভর বা নেতা সর্বস্ব সংগঠন গড়ে তুলেননি। নিখুঁত বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবমুখী কাঠামো ও পদ্ধতির কারণেই তাঁর সংগঠন ভেংগে পড়ছে না।

২ ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে একাধারে চিন্তাবিদ ও সংগঠক এবং স্বয়ং সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) সমাজ বিপ্লবের যে চিন্তাধারা রেখে গেছেন এর ভিত্তিতে সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শাহ সাহেব নিজে কোন সংগঠন গড়ে তুলেননি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) ও ইমাম গাজ্জালী (রঃ) নিজ নিজ যুগে সকল রকমের চিন্তার বিভ্রান্তির মুকাবিলায় এমন বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাধারা পরিবেশন করেছেন যা উম্মতকে গুমরাহী থেকে হেফাযত করার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নিজেদের নেতৃত্বে তারা জনগণকে সংগঠিত করেননি। কার্লমার্কস চিন্তা রেখে গেছেন, কোন সংগঠন গড়ে তুলেননি। তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তিতে লেনিন সংগঠন করেছেন।

মাওলানা মওদূদী একাধারে চিন্তাবিদ, সংগঠক ও সংগঠনের নেতা। রাজনৈতিক ময়দানেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাস্তব ময়দানে অবতরণ করে আন্দোলন পরিচালনা করার কারণেই তাঁর চিন্তাধারায় স্ববিরোধিতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা বা কল্পনা বিলাস নেই।

একমাত্র নবীগণের মধ্যেই চিন্তা ও কর্মের নেতৃত্ব এক সাথে পাওয়া যায়। উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির জীবনে উভয় নেতৃত্বের সমন্বয় খুব কমই পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পক্ষে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মধ্যে উভয় নেতৃত্বের যেটুকু উদাহরণ পাওয়া যায় এতটুকু অনেক চিন্তাবিদের মধ্যে দেখা যায় না। এ বিবেচনায়ই মাওলানা মওদূদী (রঃ) এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিনি নিঃস্বার্থতা, নিষ্ঠা, বলিষ্ঠতা, নির্ভিকতা, সহনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের এমন আদর্শ রেখে গেছেন যা চিরকাল অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামী আন্দোলনের শাশ্বত মহান নেতা রাসূল (সাঃ)-কে পূর্ণরূপে অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

রাজনীতিবিদ মওদূদী

রাজনীতিবিদ হিসাবে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাজনীতিকে প্রচলিত কলূষ থেকে পবিত্র করার সাধনাই আজীবন তিনি করে গেছেন। বিরোধীদের অশালীন আক্রমণের জওয়াবে কখনও এমন ভাষা ব্যবহার

করেননি যা কারো মনে ব্যথা দিতে পারে। গালির জওয়াবে যুক্তি পেশ করাই তাঁর নীতি ছিল। এরপরও যাদের গালি বন্ধ হয়নি তিনি তাদের কথার জওয়াব না দেয়াই সঠিক জওয়াব মনে করতেন।

একবার লাহোরে মাওলানার নিয়মিত বৈকালিক আসরে এক যুবক আলেম বললেন, "মাওলানা ! আমি বড় বড় আলেমগণের দরবারে যেয়ে থাকি এবং অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাচ্ছি। সেদিন মাওলানা গোলাম গওস হাযরাভীর খেদমতে গেলাম। তিনি এক প্রশ্নের জওয়াবে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রাগত ভাষায় বললেন, মওদূদীকে এত কড়া ভাষায় বারবার কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও সে কোন জওয়াবই দেয় না। আমার সাথে তর্কে আসেই না। যদি জওয়াব দিত তাহলে তাকে দেখে নিতাম যে, সে কতটুকু তর্কে টিকতে পারে।"

আমি লক্ষ্য করলাম, যে যুবক আলেমটি প্রবল উৎসুক্য নিয়ে ঘাড় কাত করে মাওলানার জওয়াব শুনবার জন্য এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাওলানা অতি শান্তভাবে কুরআনের দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, "মুতু বেগাইযিকুম" যার অর্থ হলো "তোমাদের ক্রোধে তোমরাই জ্বলেপুড়ে মর" তিনি এ বিষয়ে আর কিছুই বললেন না। যুবকটি বিস্মিত হয়ে বললেন, "যারা আপনাকে গালি দেয় তারা কত বোকা।"

রাজনীতির ময়দানকে স্বচ্ছ ও সুস্থ রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট তিনি সুস্পষ্ট নীতিমালা পেশ করেছেন যা সবাই সঠিক বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তবে কেউ পালন করেননি। কিন্তু অপর পক্ষ পালন না করা সত্ত্বেও নিজে আজীবন ঐসব নীতিমালা মেনে চলেছেন।

ইসলামী রাজনীতি এ যুগে মাওলানা মওদূদীরই আবিষ্কার। উপমহাদেশের আলেম সমাজের মধ্যে যারা রাজনীতি সচেতন ছিলেন তারা ইসলামী রাজনীতির কোন ধারা সৃষ্টি করেননি। একদল আলেম কংগ্রেসের রাজনীতি অনুসরণ করেছেন, আর একদল মুসলিম লীগের রাজনীতি সমর্থন করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই মূল নেতৃত্বে কোনো আলেম ছিলেন না। আলেম সমাজ সমর্থকের ভূমিকাই পালন করেছেন। মাওলানা মওদূদীই ইসলামী আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইসলামী রাজনীতির সূচনা করেন।

১৯৫০ ও ৫১ সালে সর্বপ্রথম আলেম সমাজের নেতৃস্থানীয় ৩১ জন ব্যক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিকে মজবুত করেন। ঐ ২২ দফা প্রণয়নে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা যে প্রধান ছিল তা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা

নয়। জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদীর আবিষ্কৃত ইসলামী রাজনীতিই অনুসরণ করে চলেছে। ইসলামী রাজনীতি এ উপমহাদেশে এ শতাব্দিতে মাওলানা মওদূদীই চালু করেছেন। বালাকোটে ১৮৩১ সালে মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শহীদ হবার একশ বছর পর মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাজনীতির সূচনা করেন।

সংস্কারক মওদূদী

একজন মহান সংস্কারক হিসাবে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট এবং তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। ইসলাম যখন একটি ধর্মের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাকওয়া দ্বারা যখন ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনই বুঝাতো এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যখন ইসলামের বাইরের বিষয় মনে করা হতো তখন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে পেশ করে মাওলানা মওদূদী এত বিরাট সংস্কার সাধন করেন যার ফলে এখন শুধু আলেম সমাজেই একথা স্বীকৃত নয় ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাও "ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান" বলে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন।

মাযহাবী ঝগড়া ও হানাফী-আহলে হাদীস বিরোধের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, চার মাযহাব ও আহলে হাদীস একই "আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সবাই হকপন্থী। সব মাযহাব একই রাসূলের আনুগত্য করছে যদিও কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ব্যাখ্যায় কোন ফাঁক রাখেননি সেখানে সব মাযহাব ও আহলে হাদীসে কোন মতভেদ হয়নি। যেখানে ব্যাখ্যার ফাঁক রয়েছে সেখানে যে মতভেদ হয়েছে তা দূষণীয় নয়। যেসব বিষয়ে যার যে মত পছন্দ তা গ্রহণ করতে পারেন। কোন এক ব্যাখ্যাকে অন্য মতের কেউ বাতিল বলে ঘোষণা দিবার অধিকার রাখেন না। মাযহাবের অনুসারীদেরকে 'মুকাল্লিদ' বলে গালি দেয়া এবং আহলে হাদীসকে 'গায়রে মুকাল্লিদ' বলে তুচ্ছ মনে করা অত্যন্ত অন্যায় বলে তিনি ঘোষণা করেন।

চার মাযহাবে বিভিন্ন মাসলায় যে পার্থক্য রয়েছে এবং হানাফী ও আহলে হাদীসে যেসব জায়গায় মতপার্থক্য আছে তা দূর করার চেষ্টা করা অর্থহীন। এ পার্থক্য স্বাভাবিক। চার মাযহাবকে এক করার চেষ্টা করতে গেলে ৫ম মাযহাব সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে। তাই এ পার্থক্যকে মেনে নিয়ে চলাই উম্মতের ঐক্যের জন্য জরুরী। মাযহাবী কেতনা দূর করার এ মহান সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা মাওলানার এক বিরাট খেদমত।

এ সংস্কারের ফলেই জামায়াতে ইসলামীতে সব মাযহাব ও আহলে হাদীসের অনুসারীদের ঐক্য সম্ভব হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন হিসাবে কোন মাযহাবকে মেনে চলে না। জামায়াতের ব্যক্তিগণ যে কোন মাযহাব বা আহলে হাদীসের অনুসারী হতে পারেন। তাই জামায়াতের মূল নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সংগঠনের সকল স্তরে হানাফী ও আহলে হাদীসের অনুসারীগণ একসাথে মিলে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে কর্মরত রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব

মাওলানা মওদূদী মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম। যারাই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করে তারা যে দেশেই বাস করুক তাদের নিকট মাওলানা একজন প্রিয় লেখক। দুনিয়ার বহু ভাষায় মাওলানার সাহিত্য অনূদিত হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে যারা বই তালাশ করে তারা সহজেই মাওলানার রচনার নাগাল পায়। ১৯৫৩ সালে মাওলানার ফাঁসির হুকুমের খবর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ৬০টি দেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানায়। আজ থেকে ৩৭ বছর পূর্বেই তিনি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে থাকলে তিনি বর্তমানে আরও কত ব্যাপকভাবে পরিচিত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে লণ্ডনে মাওলানাকে ইউ. কে. ইসলামী মিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় "ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপ"-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আয্যাম বলেন, "মুহতারাম মাওলানা ! আপনি শুধু পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা নন। দুনিয়ার যত দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে সব দেশের নেতা ও কর্মীরা আপনাকে তাদের মহান পথপ্রদর্শক মনে করে।" সেখানে আমি আয্যাম সাহেবের পাশেই মঞ্চে বসা ছিলাম। বিভিন্ন দেশের যারা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারা ঐ কথার সমর্থনে উৎসাহের সাথে মাথা নাড়লেন।

প্রায় ৭ বছর প্রবাস জীবনে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বড় বড় নেতার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেই মাওলানাকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে মহব্বত প্রকাশ করেছেন। তাঁর একজন নগণ্য সাথী হওয়ার কারণে আমিও তাঁদের নিকট সম্মান পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছি।

আলেমে দ্বীন হিসেবে

আলেমে দ্বীন হিসাবে মাওলানা মওদূদীর মর্যাদা তারাই বুঝতে সক্ষম যারা মাওলানার রচিত তাফসীর অধ্যয়ন করেছেন। ইলম এমন এক মহা নিয়ামত যা আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ্ পাক মাওলানাকে এ যুগের মানুষের হেদায়াতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। তা না হলে এত বড় বড় আলেম থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে এর পূর্ণ ও আসল রূপে পরিবেশনের এবং ঐ পূনাঙ্গ ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সৌভাগ্য মাওলানার হতো না।

বিশ্বের আলেম সমাজের নিকট আলেমে দ্বীন হিসাবে মাওলানা মওদূদীর মর্যাদা স্বীকৃত। এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক কারণে বা ফেরকা বন্দীর দরুন অথবা সমসাময়িক পরিবেশে মাওলানার দাওয়াত কবুল করার পথে বাস্তব সমস্যার অজুহাতে ওলামায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ মাওলানা মওদূদীর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। আমার নিশ্চিত ধারণা যে কোন আলেম যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁর ধারণা অবশ্যই পাল্টাবে। যারা বিরূপ ধারণা প্রকাশ করে থাকেন তাঁদের বেশ কয়েকজন সম্পর্কে খবর নিয়ে জানা গেল যে তাঁরা নিজেরা মাওলানার বই না পড়েই অন্য কোন আলেমের মন্তব্যের উপর আস্থা স্থাপন করে আছেন।

এ বিষয়ে আমার রচিত "ইকামাতে দ্বীন" বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাছাড়া "আলেম সমাজের খেদমতে আকুল আবেদন" নামক পুস্তিকায় অতি শ্রদ্ধার সাথে ওলামায়ে কেরামকে মাওলানা মওদূদীর তাফসীর, রাসায়েল ও মাসায়েল এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের আবেদন জানিয়েছি।

মাওলানার দারস ও বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মওদূদীর বহু বক্তৃতা অনুবাদ করার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার যেসব বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে তা উল্লেখ করছি ঃ

১। জনসভা হোক আর সুধী সমাবেশ হোক যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিতেন তার সামনে এক টুকরা কাগজ থাকত। আগেই পয়েন্টগুলো সাজিয়ে নোট করে রাখায় শ্রোতাদের নিকট গোটা বক্তৃতা আকর্ষণীয় হতো। বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ সভা থেকে যেতে পারতো না। একের পর এক একটি পয়েন্টের যুক্তি শ্রোতাদেরকে বক্তব্যের উপসংহার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতো।

২। বক্তৃতার সময় কখনও উচ্ছ্বাস প্রদর্শন, উত্তেজিত হওয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা, টেবিল চাপড়িয়ে, হাত নেড়ে, গলা ফাটিয়ে ময়দান গরম করা ইত্যাদি কখনও তাঁর মধ্যে দেখিনি। অতি শান্তভাবে শ্রোতাদের মন-মগজ দখল করার অদ্ভুত কৌশলই তার বক্তৃতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কখনও নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করতেন না। তিনি যা কিছু করেছেন তা জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের অবদান বলেই প্রকাশ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সামান্য প্রচেষ্টাও তাঁর বক্তৃতায় লক্ষ্য করা যায়নি।

৪। দাওয়াতের সত্যতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা ও উদ্দেশ্য হাসিলের দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি শ্রোতাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করতে পূর্ণ আস্থাবোধ করতেন যার ফলে বক্তৃতায় কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করতেন না।

৫। যে বিষয়ে তিনি বক্তব্য পেশ করতেন সে বিষয়ের হক পুরোপুরি আদায় করতেন। ঐ বিষয়ের কোন দিক ছেড়ে দিতেন না। ফলে শ্রোতাদের মনে কোন প্রশ্ন বাকী থাকতো না, বরং যেসব প্রশ্ন তাদের মনে জাগত তারও জওয়াব বক্তৃতার মধ্যে পেয়ে যেত।

মাওলানার বক্তৃতা, দারস ও বৈঠকী আলোচনা শুনবার সুযোগ বহুবার পেয়েছি। ১৯৫৫ সাল থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত একটানা ১৮ বছর তাঁর মুখের কথা বিভিন্ন রূপে শুনেছি। সর্বশেষে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে তিনদিন তাঁর লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছি।

তাঁর বক্তৃতা, দারস, প্রশ্নোত্তর, বৈঠকী কথাবার্তা যতবারই শুনেছি মুগ্ধ হয়ে তৃপ্তির সাথেই শুনেছি। বক্তৃতা ও দারসে তিনি আলোচ্য বিষয় যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করতেন এর সাথে তাঁর লিখিত বইয়ের পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বই-এর পাঠককে আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাঁর শ্রোতাদের জন্যও সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে তিনি পয়েন্ট ভিত্তিতে সাজিয়ে এক একটি পয়েন্টের পক্ষে যুক্তি পরিবেশন করতেন যাতে শ্রোতার মন বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝে নিতে পারে।

তাঁর বাচনভংগীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো ধীরস্থিরভাবে আবেগহীন আওয়াজে কথা বলা। উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশেও তাঁর স্বর তেমন উচ্চ হতো

না এবং মুখ ও হাতে উত্তেজনার কোন প্রকাশ ঘটতোনা। তর্জন-গর্জন করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো অগ্নিঝরা ভাষায় তথাকথিত জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে তাঁকে কখনও দেখিনি। ১৯৬৩ সালে লাহোরে জামায়াতের এক বিরাট সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সরকারী গুণ্ডাবাহিনী প্যাণ্ডেলে আগুন লাগিয়ে গুলী করে আল্লাহ্ বখস নামক একজনকে শহীদ করে বক্তৃতা মঞ্চের কাছাকাছি এসে ওরা যখন মাওলানাকে 'গাদ্দার' বলে গালি দিচ্ছিল তখনও উত্তেজনার সুরে কথা বলতে শুনিনি।

৭২ সালে লায়ালপুরে এক বিরাট সীরাতুন্নবী মাহফীলে আমিও একজন বক্তা ছিলাম। আমার পরে বিখ্যাত কবি ও তুখোর বক্তা শুরেশ কাশ্মীরী রাত বারটায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা জানেন যে আল্লাহ্ পাক আমাকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে শ্রোতাদেরকে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতার যাদু দিয়ে মোহিত করে রাখতে পারি। আমার ভাষার অলংকার ও মাঠ গরম করার মতো উচ্চ আওয়াজ আপনাদেরকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে, মাওলানা মওদূদী ধীরে ধীরে শান্তভাবে বক্তৃতা করলেও মানুষের দিলে এত বেশী আছর কেমন করে হয়। আমার মতো বক্তাও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। তাঁর কথাই আলাদা। আমাদের কথায় তো এত আছর হয় না। তাই শব্দের ফুলঝুড়ি, ভাষার চাকচিক্য ও গলার সুর দিয়ে মানুষকে মাতিয়ে রাখতে হয়। আমি কথা শুরু করলে তো দু' তিন ঘন্টার মধ্যে কেউ উঠতেই পারবে না। তাই যাদের পক্ষে এত সময় বসে থাকলে কাপড় খারাপ হবার আশংকা আছে তারা এখনই চলে যান।"

মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা সম্পর্কে শুরেশ কাশ্মিরীর মন্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আল্লাহ্ পাক তাঁকে দায়ী ইলাল্লাহর এমন এক মর্যাদা দান করেছেন যে, তিনি যখন বক্তৃতা করেন তখন কুরআন ও সুন্নাহর মর্মবাণী ছাড়া আজেবাজে কোন কথা বলেন না, তাই যারা শুনে তাদের দিলে এক পবিত্র ভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং সে কারণেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে।

দারসে কুরআনে বক্তৃতার উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমভাবেই পাওয়া যেতো। অবশ্য দারসের মধ্যে আরও কতক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি ঃ

১। তেলাওয়াত, অনুবাদ ও শানেনুযূল আলোচনার পর যখন তিনি আলোচ্য আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করতেন তখন এমন মনে হতো যে, তিনি নিষ্ঠার সাথে কুরআনের বক্তব্যই তুলে ধরছেন। দারসের সুযোগ নিয়ে নিজস্ব চিন্তাধারা পেশ করছেন বলে সামান্য সন্দেহও জাগতো না। দারসের মূল শিক্ষার পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস এমনভাবে পেশ করতেন

যাতে মনে হতো যে কুরআনই যেন কথা বলছে, মাওলানা শুধু সাজিয়ে দিচ্ছেন।

২। দারসের পর শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন, যাতে দারসের বক্তব্য গ্রহণ করতে কোন বাধা বাকী না থাকে। ফলে শ্রোতাগণ পরম তৃপ্তির সাথে কুরআনের আলোতে হৃদয়কে উজ্জ্বল করতে সক্ষম হতো।

তাঁর দারসে কুরআন পেশ করার ধরন তাঁর লেখা তাফসীরেরই মতো সাজানো ও সাবলীল। পয়লা তিনি দারসের জন্য বাছাই করা আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। এরপর অনুবাদ পেশ করেন। তারপর শানে নুযূল বা পটভূমি বর্ণনা করেন। অতঃপর আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচনা করেন। সবশেষে এ আয়াতগুলো থেকে কী শিক্ষা ও উপদেশ পাওয়া গেল তা তুলে ধরেন।

তাঁর বক্তৃতায় যেমন পয়েন্ট সাজানো গুছানো থাকে, দারসেও তাই। তিনি যা বলতে চান তা এমন চমৎকারভাবে এক একটি করে পরিবেশন করতে থাকেন যে শ্রোতাদের বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

বৈঠকী আলোচনায় তিনি শ্রোতাদের জানার বিষয়কে এমন স্বচ্ছভাবে পেশ করেন যে বিষয়টির কোন দিক অস্পষ্ট থাকে না। কোন প্রশ্ন করলে তিনি যেভাবে জওয়াব দেন তাতে বুঝা যায় যে প্রশ্নকর্তার মনে এ প্রশ্নটা কী কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি ধরতে পেরেছেন। তাই তাঁর জওয়াবে প্রশ্নকর্তা পূর্ণ তৃপ্তিবোধ করে। আমি তাঁকে অগণিত প্রশ্ন করে যেসব জওয়াব পেয়েছি তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁকে এক বিশেষ দক্ষতা দান করেছেন।

লেখক মওদূদী সম্পর্কে পাঠকদের মনে যে ধারণা জন্মে তা তাঁর বই পুস্তক থেকে সবাই বুঝতে পারেন। তাঁকে যারা দেখেননি বা যারা তাঁর বক্তৃতা শুনেননি তারা তাঁর লেখা থেকেই তাঁকে চিনতে পারেন। আমি লেখক মওদূদী ও বক্তা মওদূদীর মধ্যে ঘনিষ্ট মিল দেখতে পাই। বক্তব্য বিষয়কে পয়েন্ট ভিত্তিক সাজানো, বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা এক একটি পয়েন্টকে গুছিয়ে পেশ করা, স্বচ্ছ ভাষায় বক্তব্য পারিবেশন করা ইত্যাদিতে তার লেখা ও বক্তৃতায় কোন পার্থক্য নেই। তাঁর পাঠক ও শ্রোতাকে তাঁর সাথে চলতে কোথাও হোচট খেতে হয় না।

আমার কতক প্রশ্নের জওয়াব

আল্লাহ্ পাক আমাকে এত সুযোগ দিয়েছিলেন যে, আমি মাওলানাকে অগণিত প্রশ্ন করে জওয়াব নিতে পেরেছি। কোন সময় আনুষ্ঠানিক

সাক্ষাতকালে, কখনও এক সাথে যাতায়াতের সময়, নাস্তা ও খাবার সময়, এমন কি বিমান বন্দরে বিদায়ের পূর্বে ভেতরে যাবার ডাক পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা কালেও প্রশ্ন করার সুযোগ ছাড়িনি। তাঁর লিখা পড়ে যা শিখেছি তা মনে আরও জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। আমাকে বহু লোক এমন প্রশ্ন করেছেন যার সঠিক ও সন্তোষজনক জওয়াব তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। প্রশ্ন করার এ সুযোগ না পেলে আমার জ্ঞান পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যেত। তার তাফসীর ও বিপুল সাহিত্য এবং সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করে যা জেনেছি তা মিলে আমার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে সুধী মহলের সামনেও যে কোনো প্রশ্নের জওয়াব দিতে হিম্মত পাই।

তাঁকে কি কি প্রশ্ন করেছি তা সব অবশ্য মনে নেই—যদিও সে সবের জওয়াব আমার জ্ঞানের পাত্রে জমা আছে। এখানে আমার কয়েকটি প্রশ্ন ও এর যে জওয়াব তিনি দিয়েছেন তা উল্লেখ করছি ঃ

ইসলামী আন্দোলনের ধারণা কোথায় পেলেন ?

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে করাচিতে জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনের পূর্বে একান্ত সাক্ষাতের সুযোগে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করেছিলাম তাহলো ঃ দেশে বহু বড় বড় আলেম আছেন যারা আজীবন কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন। ইসলাম যে মানুষকে আন্দোলনের ডাক দেয় এবং কুরআন যে সে আন্দোলনেরই পথ নির্দেশক (গাইড বুক) একথা তাদের কাছ থেকে আমি জানতে পারিনি। আপনি তাদের মত মাদ্রাসা পাশ আলেম না হয়েও ইসলামের এ বিপ্লবী রূপ সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ধারণা কি ভাবে পেলেন ?

মৃদু হেসে জওয়াব দিলেন, "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" বই থেকে এ ধারণা লাভ করেছি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "এ বই তো আপনারই লেখা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

তিনি বললেন, "এ বই লিখতে গিয়ে আমাকে যে গবেষণা করতে হয় তার ফলে ইসলাম সম্পর্কে অতীত ও বর্তমান কালের মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের বিরাট সংখ্যক গ্রন্থ আমাকে মন্থন করতে হয়। "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" রচনা করতে গিয়ে যে অধ্যয়ন ও সাধনা করতে আমি বাধ্য হই তারই ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।"

আমি জানতে চাইলাম, জিহাদ সম্পর্কে এ গবেষণার প্রয়োজন কেমন করে বোধ করলেন?

তিনি বললেন, "১৯২৬ সালে আবদুর রশীদ নামে এক মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে।—উক্ত স্বামী ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত হিন্দু মনে করতেন এবং শুদ্ধি করণের মাধ্যমে তাদেরকে হিন্দু বানাবার আন্দোলনের নেতা ছিলেন। সে আন্দোলনের নামই ছিল "শুদ্ধি আন্দোলন"।—হত্যার অপরাধে উক্ত আবদুর রশীদের ফাঁসি হয়। তিনি বিচারকের নিকট বলিষ্ঠভাবে হত্যার উদ্দেশ্য অকপটে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "একজন মুসলিম হিসাবে আমি ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেছি। ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ ও জঘন্য অপপ্রচার চালাবার কারণে তাকে হত্যা করা আমি কর্তব্য মনে করেছি। ইসলাম জিহাদের যে কর্তব্য মুসলিমের উপর ধার্য করেছে তা পালন করা আমার ঈমানী দায়িত্ব ছিল। এর পুরস্কার আমি আখিরাতে পাব। দুনিয়ায় এর কারণে আমার উপর যে মুসিবতই আসুক তা আমি হাসি মুখে কবুল করব।"

এ হত্যার প্রতিক্রিয়ায় মিষ্টার গান্ধীর মতো 'উদার মনা' বলে পরিচিত ব্যক্তিও মন্তব্য করলেন, "মুসলমানদের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়।" গোটা ভারতে হিন্দু নেতারা জিহাদের বিধানের প্রতিবাদে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুললেন এবং জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে চরম অপপ্রচারে মেতে উঠলেন।

সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুসলিম বাগ্মী মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর দিল্লীর জামে মসজিদে এ বিষয়ে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর আক্ষেপ করে বললেন, "আল্লাহর এমন কোন বান্দাহ কি নেই যে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে মানুষকে সঠিক ধারণা দিতে পারে যাতে ইসলামের দুশমনদের অপপ্রচারে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তার অপনোদন সম্ভব হয়?"

তাঁর আবেগময় আক্ষেপের সুর আমার অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ কাজ আমিই করব। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "আল জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব তখন আমার উপর থাকায় আমার গবেষণার ফসল প্রকাশ করাও সহজ ছিল।

"১৯২৬ সালে যখন জিহাদ সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করা শুরু করি তখন আমার কল্পনায়ও আসেনি যে শেষ পর্যন্ত এ গবেষণা এত বড় গ্রন্থের জন্ম দেবে। এ গ্রন্থ রচনায় দীর্ঘ তিন বছর লেগে যায়। খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধাকারে তা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

গোটা ভারতের প্রধান ওলামা সংগঠনের মুখপত্রে আমার লেখা প্রকাশিত হতে থাকায় গোটা আলেম সমাজের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়। দেওবন্দ, সাহারামপুর, লখনও, দিল্লী ও দেশের বহু মাদ্রাসার মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ও মুফতী এবং বড় বড় ইসলামী লাইব্রেরীতে গবেষণায় রত কিছু চিন্তাবিদ এ কাজে আমাকে উৎসাহ দেবার সাথে সাথে বিভিন্ন পয়েন্ট আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্য এমন এমন মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়নের পরামর্শ দেন যার মধ্যে কতক বইয়ের নামও আমার জানা ছিল না।

বিশেষ করে "আল জমিয়ত" পত্রিকার প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহর বিশ্ব বিখ্যাত বিরাট লাইব্রেরী ব্যবহার করার অবাধ অধিকার তিনি আমাকে দিলেন। শুধু তাই নয়, যেসব বই অধ্যয়নের পরামর্শ আমি পেতাম তার মধ্যে যেসব তাঁর লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতো না, তাও তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে যোগাড় করে দিতেন। যারা চিঠি দিয়ে বিভিন্ন বই পড়ার পরামর্শ দিতেন তাদের নিকট লিখলে তাঁরা আগ্রহের সাথে বই পাঠিয়ে দিতেন।

ব্যাপক অধ্যয়ন সত্ত্বেও যেসব পয়েন্ট সম্পর্কে মনে খটকা লাগতো বা যেসব বিষয় অস্পষ্ট মনে হতো সেসব ব্যাপারে মুফতী সাহেবের পরামর্শ নিয়ে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের প্রখ্যাত উস্তাযগণের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেতাম। এসব আলোচনার সুযোগে আমি এমন কতক যোগ্য আলেমের সন্ধান পেয়েছি যাদেরকে আমি আমার মহান উস্তায বলে শ্রদ্ধা করি। এ উস্তাযগণের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে গভীর জ্ঞানী ছিলেন সে বিষয়েই তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছি। আমার মনে হয়েছে যে, এক দু ঘন্টার জ্ঞান চর্চায় তাদের কাছ থেকে জ্ঞানের এমন সন্ধান পেয়েছি যা নিজে চেষ্টা করে বহু বছরেও হয়তো পেতাম না।

এ উস্তাযগণ তাদের নিয়মিত সাগরিদদেরকে সবক দিয়ে যেভাবে শেখান সেভাবে এক বছরেও এতটা শেখা সম্ভব নয়, যতটা এক বৈঠকেই তাঁরা আমাকে শেখাবার চেষ্টা করতেন। আমি যে বিষয়ে গবেষণা করছিলাম এর গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতেন বলেই তাঁদের মনে আমাকে শেখাবার গরজ যেন আমার শেখার আগ্রহ থেকেও বেশী ছিল।

এমনি ভাবে "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" রচনায় বহু মনীষীর অবদান রয়েছে। অনেকের জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আমি বিভিন্ন দিকের জ্ঞান আহরণ করেছি। এ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের যে গভীর

অধ্যয়ন করতে হয়েছে তারই ফলে ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি।"

মাওলানার সাথে এ আলোচনার কিছুদিন পূর্বেই "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" বইটি আমি পড়েছি। অধ্যয়ন কালেই বইটিতে লেখা একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। ১৯২৮ সালে তিনি এ বইটি রচনা সমাপ্ত করেছেন। তাতে এক জায়গায় লিখেছেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখনই শুরু হয় তা পোলাণ্ড থেকে শুরু হবে।" এ বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগল যে, তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী কেমন করে সত্যে পরিণত হলো ? বইটি লেখার এগার বছর পরে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় পোলাণ্ড থেকেই। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে আপনার উপরে কি ইলহাম হয় কিনা ? তা না হলে এমন ভবিষ্যদ্বাণী কেমন করে করতে পারলেন ?

স্মিত হেসে জবাব দিলেন, "ইলহাম হয় কিনা জানি না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ভার্সাই সন্ধি হয় তা বিশ্লেষণ প্রসংগে অংকের হিসাবের মতো যুক্তি দিয়ে ঐ মন্তব্য করেছিলাম যা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। এটা ভার্সাই সন্ধির পক্ষপাতিত্বের স্বাভাবিক পরিণাম।"

আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আল জমিয়ত" পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় জিহাদের উপর গবেষণার এত বড় সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ঐ পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করলেন কেন ? ঐ পদে থাকলে ইসলামের আরও বিরাট খেদমত করতে পারতেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে আপনার যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাও কাজে লাগাতে পারতেন এবং ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলবার বিরাট সুযোগ পেতেন।

তিনি আফসোসের সুরে জওয়াব দিতে গিয়ে বললেন, "জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা সবাই আমার মুরব্বী পর্যায়ের লোক ছিলেন। তাঁরা বয়সে যেমন প্রবীণ ছিলেন, তেমনি দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হিসাবেও জনগণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর। তাঁদের খুবই স্নেহভাজন ছিলাম। কিন্তু "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" রচনার পর ইসলামী আন্দোলনের দিকে আমার চিন্তা-চেতনা এমনভাবে ধাবিত হলো যে, জমিয়ত নেতৃত্বের পলিসীর সাথে আমি খাপ খাওয়াতে পারলাম না।

দশ বছর আগে থেকে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলামা হিন্দের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তখন ইংরেজ তাড়াবার আন্দোলন

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার মুকাবিলা করে পত্রিকার পলিসী পরিবর্তন করার সাধ্য আমার ছিল না। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কংগ্রেস শাসন যে মুসলমানদের জন্য আরও নিকৃষ্ট দাসত্বের ব্যবস্থা করবে সে কথা জমিয়ত নেতৃত্ব উপলব্ধি করেননি। তা ছাড়া এক বাতিল শক্তির বদলে নিকৃষ্টতম বাতিলকে কায়েম করা ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। চিন্তার ক্ষেত্রে পত্রিকার পরিচালকগণের সাথে আমার এতবড় পার্থক্য নিয়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না।

আবার প্রশ্ন করলাম, "আল জমিয়ত থেকে পদত্যাগ করার চার বছর পর ১৯৩২ সালে হায়দ্রাবাদ থেকে আপনি মাসিক "তরজুমানুল কুরআন" পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন। ইসলামী আন্দোলনের চেতনা সৃষ্টির পর আন্দোলনের সূচনা পর্ব শুরু করতে দীর্ঘ চার বছর বিলম্ব হলো কেন" ?

জওয়াবে বললেন, "ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করা। আধুনিক বিশ্বে মানুষ যেসব সমস্যায় ভুগছে এবং উন্নত দেশগুলোতে এর যে ধরনের সমাধানের চেষ্টা চলছে সে বিষয়ে ইতিমধ্যে আমার যতটুকু ধারণা জন্মেছে তাতে ইসলামী রাষ্ট্রে ঐসব সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে সে ভাবনা আমাকে পেরেশান করে তুললো। প্রচলিত সমাধান যে মোটেই সন্তোষজনক নয় তা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ইসলামী সমাধান কি হতে পারে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার তালাশে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম।

আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় ভুপালের নওয়াব এষ্টেটের কর্মচারী ছিলেন। তাঁরই সহযোগিতায় নওয়াবের বিশাল ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে এ কয়টি বছর অধ্যয়নে কাটাই। আধুনিক চিন্তাধারার ব্যাপক অধ্যয়ন আমার মধ্যে সত্যিকার জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়ে দিল। প্রাচীন ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা তাফসীর ও গ্রন্থাদি ঘেটে যথেষ্ট আলোর সন্ধান পেলেও আধুনিক সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব বোধ করতে থাকলাম। অবশেষে সরাসরি কুরআন মজীদ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করে মনে হলো যে, সব সমস্যার সমাধান এখানেই রয়েছে।"

এ প্রসংগে মাওলানার একটি সংক্ষিপ্ত রচনার কথা মনে পড়ে। "মেরী মুহসিন কিতাব" (আমার প্রিয়তম পুস্তক) শিরোনামে একটি সংকলন পড়েছিলাম। তাতে ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মকথা ছিল।

বিভিন্ন ব্যক্তি তার প্রিয়তম পুস্তক সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। ঐ সংকলনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) অত্যন্ত উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন ঃ

"আমি দশ বছর ব্যাপক পড়াশুনা করে একটি বিরাট লাইব্রেরী আমার মগজে উঠিয়ে ছিলাম। মানব সমস্যার বহু মূল্যবান বিশ্লেষণ শিখলাম। কিন্তু ঐ চিন্তাবিদদের দেয়া সমাধান আমার নিকট সন্তোষজনক মনে হলো না। কিন্তু সঠিক সমাধান কী তাও জানা ছিল না। মানব সমস্যার ব্যাপক ধারণা ও বিশ্লেষণ মগজে নিয়ে যখন সিরিয়াসলি কুরআন অধ্যয়নে মশগুল হলাম তখন মনে হলো যেন অল্প কথায় প্রতিটি সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছি। আমার ধারণা হলো যেন আমি এমন এক শাহে কালীদ (Master Key) পেয়ে গেলাম যা মানব সমস্যার যে তালায়ই ব্যবহার করি সে তালাই খুলে যাচ্ছে। তাই আমি কুরআনকেই আমার "মুহসিন কিতাব" মনে করি।

তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। চল্লিশ দিন ব্যাপী এ সফরে তাঁর বক্তৃতা ও বৈঠকী আলোচনায় অনুবাদকের দায়িত্ব প্রধানতঃ আমাকেই পালন করতে হয়। সে উপলক্ষে এক সাথে যাতায়াত, খাওয়া ও থাকার ফলে অনেক প্রশ্ন করার সুযোগ হয়।

আমি তাবলীগ জামায়াতে ইতিপূর্বে চার বছর অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে কাজ করায় ঐ জামায়াত সম্পর্কে মাওলানার মতামত জানার খুবই আগ্রহ ছিল। তাবলীগ জামায়াত ত্যাগ করা সত্ত্বেও ঐ জামায়াতের বিরূপ সমালোচনা কখনও আমি পছন্দ করিনি। ঐ জামায়াতের দ্বারা দ্বীনের যতটুকু খেদমত হচ্ছে তা অকপটে আমি প্রকাশ করে থাকি এবং আমার লেখা একাধিক বইতে তা উল্লেখও করেছি। মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? তিনি জওয়াবে বললেন, আমি মাওলানা ইলইয়াস সাহেবের প্রাথমিক কর্মস্থল পূর্ব পাঞ্জাবের মিওয়াদে যেয়ে এ জামায়াতকে জানার চেষ্টা করেছি এবং অশিক্ষিত, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ লোকদেরকে তিনি যে পদ্ধতিতে ইসলামের আলো দান করছিলেন তার প্রশংসা করে মাসিক তারজুমানুল কুরআনে আমি লিখেছি।

একথা বলে আমাকে তিনি উপদেশ দিলেন যে "দ্বীনের কাজ যে যেখানে যতটুকু করছে তাতে আমাদের কাজ হচ্ছে বলে মনে করতে হবে। দ্বীনের সবটুকু কাজই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দ্বীন কায়েম হলে সরকারী উদ্যোগে ও

পৃষ্ঠপোষকতায় সব রকম কাজই জনগণকে দিয়ে করান যাবে। কিন্তু এর পূর্বে অন্যদের দ্বারাও অনেক কাজ হওয়া প্রয়োজন।"

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, এই যে মসজিদের মক্তবগুলোতে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়া হয়, এটা কি আমাদের কাজে লাগে না ? আপনারা জনসভায় যখন কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে বক্তৃতা করেন তখন এমন নিরক্ষর লোকেরাও কুরআনের আয়াত শুনলে চিনতে পারে যারা নিজের ভাষাও শিখেনি। মসজিদের মক্তবগুলোর এ খেদমতকে খাট করে দেখা অন্যায়।

এক বৈঠকে ঈমানদার ও সৎলোক তৈরীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও তাবলীগের মাধ্যমেও নেক লোক তৈরী হচ্ছে বলে আমি মন্তব্য করলে তিনি বললেন, "এসব ঈমানদার লোক যারা তৈরী করছেন তারা যদি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাদের মন-মগজ গড়ে তুলতেন তাহলে এরা সহজেই ইকামাতে দ্বীনের মুজাহিদে পরিণত হতেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তি জীবনে যারা সৎ হয়ে গড়ে উঠেন তারা বাতিল সমাজব্যবস্থারই দিয়ানতদার খাদেমে পরিণত হতে বাধ্য।

এ জাতীয় নেক লোক ঘুষ খাবে না, অন্যায় করবে না, যুলুম করবে না—এ কথা ঠিক। তারা যেখানেই কাজ করবে ইখলাসের সাথে আনুগত্য করবে। সুদী ব্যাংকে চাকুরী করতে নিষ্ঠার পরিচয় দেবে, কিন্তু সুদ-বিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার চিন্তা করবে না। বাতিল সমাজব্যবস্থা তাদের নিঃস্বার্থ খেদমত পায়। তারা এর বিদ্রোহী হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের মন-মানসিকতা যদি সৃষ্টি করা হতো তাহলে এতগুলো সৎ ও মুখলিস লোক ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলে বাতিল সমাজব্যবস্থা কবেই উৎখাত হয়ে যেতো। আফসোসের বিষয় যে, এ দৃষ্টিভংগীর অভাবে আল্লাহর বহু নেক বান্দাহ্, বাতিল নেযামের দিয়ানতদার খাদেমের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আর একবার মাওলানার সামনে এক লোক তাবলীগ জামায়াতের এজতেমায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন। তাবলীগ জামায়াতে কি আকর্ষণ আছে সে বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করছিলেন। মাওলানা বললেন, "জান্নাতের আকাংখা মানুষের রূহের খাঁটি পিপাসা। মানুষ যখন একথা বিশ্বাস করে যে অমুক আমলের ফলে বেহেশতে যাওয়া সহজ তখন সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, "তাবলীগ জামায়াতে এজতেমায়ী দোয়ায় যেভাবে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা হয় এর মধ্যে এমন এক রূহানী স্বাদ পাওয়া যায় যা আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করেছিল।" একথার উপর মাওলানা মন্তব্য করলেন, "আল্লাহর সাথে বান্দাহর যে রূহানী সম্পর্ক তা কাতরভাবে দোয়া করার দ্বারা অবশ্যই ঘনিষ্ট হয়। এ আকর্ষণও স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব পালন হলো আল্লাহর বান্দাহর আসল কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে বাতিলের নির্যাতনের শিকার হলে মাবুদের সাহায্য চেয়ে যে কাতর আবেদন জানানো হয় এর স্বাদ আরও অনেক বেশী।

মানুষের মনগড়া আইন ও শাসন উৎখাত করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের চেষ্টাই হলো সত্যিকার অর্থে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এ মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই নবী ও রাসূলগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এ কাজে পদে পদে যে বাধা রয়েছে এবং এতে তাগুতের সাথে যে সংঘর্ষ বাঁধে তখন আল্লাহর দরবারে ধরণা দিয়ে যে চোখের পানি ফেলা হয় তা কলিজার রক্ত পানি হয়ে বের হয়। ঐ কঠিন দায়িত্বের বোঝা মাথায় না নিয়ে শুধু গুনাহ মাফের জন্য ও জান্নাত লাভের ইচ্ছা নিয়ে কান্নাকাটি করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন গায়ে পাঁচড়া হলে চুলকাতে বড়ই মজা লাগে। কিন্তু এ দ্বারা পাঁচড়া ভাল হয় না। পাঁচড়া দূর করতে হলে সুচিকিৎসা প্রয়োজন।"

তাবলীগ জামায়াত প্রসংগে একবার কথা উঠল যে, তাদেরকে চীন-রাশিয়ার মতো দেশেও যেতে বাধা দেয়া হয় না। কারণ এটুকু ইসলামে তাদেরও আপত্তি নেই। একথা শুনে মাওলানা বললেন, "কালেমার যেটুকু বীজ তাঁরা ছড়াচ্ছেন এক সময় সে বীজ থেকেও ইসলামী আন্দোলনের গাছ জন্ম নিতে পারে। যেসব দেশে প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলন করতে দেয়া হয় না সেখানে তাবলীগ জামায়াত যদি দ্বীনের বীজ ছিটিয়ে দেন তা অবশ্যই বড় খেদমত। দ্বীনের জন্য যার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুর স্বীকৃতি দেয়া উচিত। দ্বীনের দাওয়াত যারাই দেন তাদের মধ্যে কুরআনের খবর অবশ্যই পৌঁছে। তাই কুরআনে এক সময় পূর্ণ দ্বীনের খবরও তারা পাবে।

একথার সমর্থনে আমার একটা ঘটনা মনে পড়লো। ১৯৮১ সালে হাজী আবদুল করীম সাইতোষ নামক একজন প্রবীণ জাপানী মুসলিম আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে তিনি জাপানেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হজ্জ করতে গিয়ে রাবেতা আলম আল ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কতক নেতার সাথে

পরিচিত হন এবং তাদের কাছ থেকেই জামায়াতে ইসলামী ও আমার পরিচয় পান। তাই দেশে ফেরার পথে তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি আমার সাহায্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ মুঃ ইসহাকের সাথে সাক্ষাত করেন যিনি তাবলীগের এক জামায়াত নিয়ে টোকিও গিয়েছিলেন এবং যার মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রঃ) প্রতি ছাত্র জীবন থেকেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মহব্বত পোষণ করার ফলে জুমআর নামাযে তাঁর রচিত খুতবাই আমি বেশী পছন্দ করতাম। ঐ খুতবার কিতাবে দ্বিতীয় খুতবায় উল্লেখিত একটি হাদীস সম্পর্কে আমার মনে খট্‌কা ছিল বলে সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীকে (রঃ) জিজ্ঞেস করলাম। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ اَهَانَهُ اللّٰهُ ـ

অর্থঃ "সুলতান দুনিয়ায় আল্লাহর ছায়া। যে আল্লাহর সুলতানকে অপমান করে আল্লাহ তাকে অপমান করে।"

এ হাদীস সম্পর্কে মাওলানা বলেন, "হাদীসটির সহী হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের দিকে না যেয়ে এর সঠিক অর্থ বুঝলে কোন সমস্যা থাকে না। আমাদের দেশে কতক আরবী শব্দের আসল অর্থের বদলে ঐ সব শব্দের উর্দু ভাষায় প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত অর্থ বুঝার পথে বিঘ্ন ঘটে। আরবীতে আমীর শব্দের অর্থ হুকুমকর্তা। উর্দুতে এর অর্থ করা হয় ধনী। সম্ভবত হুকুমকর্তারা (সরকারী ক্ষমতার অধিকারী) অন্যায় পথে ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ায় তারা ধনী লোক হিসাবে পরিচিত হয়েছে। এভাবেই হয়তো ধনী লোকদেরকে আমীর বলার রেওয়ায চালু হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে সুলতান শব্দের অর্থ বাদশাহ হয়ে গেছে। অথচ আরবীতে এর দ্বারা ক্ষমতা, রাজত্ব বা অথরিটি বুঝায়। ক্ষমতা ও রাজত্ব বাদশাহদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে উর্দুতে তাদেরকেই সুলতান বলা হতো। আরবীতে সুলতান শব্দ দ্বারা যে অর্থ বুঝায় সে অনুযায়ী হাদীসটির সহজ ও স্পষ্ট অর্থ হয় ঃ "রাষ্ট্র ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতারই প্রতিবিম্ব। তিনিই এ ক্ষমতার আসল মালিক। এ ক্ষমতা তিনিই দান করেন। এ ক্ষমতা আল্লাহর মরযী অনুযায়ী ব্যবহার করা না হলে আল্লাহর এ দানকে অপমান করা হয়। যে

আল্লাহর এ দানকে অপমান করে তাকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখিরাতে অপমান করেন।" এ হাদীস দ্বারা ক্ষমতাসীনদেরকে সাবধান করা হয়েছে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

এ হাদীসকে বদশাহদের অন্ধ আনুগত্য করার নির্দেশ হিসাবে তারাই ব্যবহার করে থাকে যারা দুনিয়ার স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের পদলেহনে অভ্যস্ত।

কতক আলেমের জামায়াত ত্যাগ প্রসংগে

১৯৪১ সালে যে ৭৫ জন লোক নিয়ে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয় তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় আলেম কেন জামায়াত ত্যাগ করলেন—এ প্রশ্নটি জামায়াতে ইসলামীর একটি বড় ত্রুটি হিসাবে কেউ কেউ মনে করেন। জামায়াতের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন দোষ রয়েছে যার দরুন তাঁরা জামায়াতে থাকা জায়েজ মনে করেননি—এ ধরনের প্রচারণা চালু আছে বলেই আমি এ বিষয়ে মাওলানার মুখ থেকে সরাসরি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ "যেসব কারণ উল্লেখ করে তাঁরা জামায়াত থেকে আলাদা হচ্ছেন বলে আমাকে লিখিতভাবে জানালেন তা পত্রিকায় প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে তাঁদের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে অনুমতি দেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশিত হলে জামায়াত সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা জনগণের মধ্যে পয়দা হতো না, বরং তারা চলে যাওয়ায় জনগণের মনে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হয়ে যেতো। হয়তো এ কারণেই আমাকে তাঁরা অনুমতি দেননি।"

আমি বললাম, "জামায়াতের স্বার্থে এবং জনগণকে বিভ্রান্তি থেকে হেফাযতের প্রয়োজনে আপনি তাদের বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করে দিলে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পেতাম।" তিনি বললেন, "এতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন এবং তাঁদের হেয় করার উদ্দেশ্যে এটা করেছি বলে মনে করতেন। আমার শরাফত আমাকে তা প্রকাশ করতে দেয়নি। আমি তাঁদের মতো ওলামায়ে কেরামের ইজ্জতের দিকে খেয়াল করেই তা করিনি। আমাকে তাঁরা শরীফ লোক হিসাবে জানুন এটাই আমি চেয়েছি। এর ফলে হয়তো তাঁরা এক সময় ফিরে আসবেন—এ আশাও পোষণ করছি।"

আমি এরপরও নাছোড়বান্দার মতো বললাম ঃ "অন্ততঃ আমাকে আপনি বলুন যাতে আমার মনে এ বিষয়ে এতমিনান বহাল হয়। আমি যাদের প্রশ্নের মুকাবিলা করতে বাধ্য হই তাদের নিকট যাতে আমাকে লাজওয়াব হতে না হয় সে জন্যই আমি জানতে চাই।"

আমার ধারণা ছিল যে, তিনি আমার এ যুক্তি মেনে নিয়ে আমাকে ঐ অপ্রকাশিত কথা জানাবেন। তিনি ধীরভাবে বললেন, "যে কারণে সে কথা পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারিনি, সে একই কারণে আপনার কাছেও বলতে পারছি না।" আশা ভংগের বেদনা সত্ত্বেও মাওলানার শরাফত ও নৈতিকতার অকল্পনীয় উন্নত মান দেখে শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর প্রশান্ত চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম।

জামায়াতের প্রতিষ্ঠা কালের ৭৫ জনের মধ্যে যে কয়জন জামায়াত থেকে বের হয়ে গেলেন তাঁদেরকে বড় আলেম হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি এবং তাঁরা দ্বীনের যে খেদমত করছেন তাও আমি অকপটে স্বীকার করি। কিন্তু সব ফরযের বড় ফরয হলো "ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালান" তাঁরা ঐ মহান দায়িত্ব পালন করছেন বলে কোন প্রমাণ নেই বলে তাদের জামায়াত ত্যাগ করার কারণ জানার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না। যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করে শুধু তাদেরকে জওয়াব দেবার জন্যই আমি তা জানতে চেয়েছিলাম।

মাওলানার বিরুদ্ধে ফতোয়ার হাকীকত

তাবলীগ জামায়াতে সাড়ে চার বছর সক্রিয় থাকার সুযোগে তাবলীগ জামায়াতের মারকায দিল্লীতে অবস্থান ও তাবলীগী সফরে অনেক ওলামায়ে কেরামের সাথে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার খবর ঢাকা ও দিল্লীতে পৌছার পর মাওলানা (রঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং কঠোর ও বিরূপ সমালোচনাপূর্ণ বহু পুস্তিকা আমার নিকট ডাকে ও লোক মারফত পৌছাতে থাকে। এসবের মধ্যে দেওবন্দ, সাহারানপুর, দিল্লী, বিহার ও করাচি থেকে প্রকাশিত বহু উর্দু পুস্তিকা ছিল।

আমি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) রচিত তাফসীর ও অন্যান্য কতক বুনিয়াদী বই ইতিমধ্যে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার ফলে মাওলানার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঐসব বিরোধী পুস্তিকায় বড় বড় নামকরা ওলামায়ে কেরামের নাম দেখে প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঐসব পুস্তিকায় মাওলানা মওদূদীর (রঃ) যেসব বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দেয়া বা সমালোচনা করা হয়েছে ঐ সব মূল বই-এর সাথে উদ্ধৃতিগুলো মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করলাম। মাওলানার রচিত তাফসীর অধ্যয়ন করে অন্তরে তাঁর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ করছিলাম তার ফলে আমার পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না।

ফলে আমাকে ব্যাপক অধ্যয়নে নিয়োজিত হতে হলো। মাওলানার মূল বইগুলো যোগাড় করতে বাধ্য হলাম এবং বিরোধী পুস্তিকাগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়তে লাগলাম। কোন কোন বিষয়ে মাওলানার মতামত খণ্ডন করে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে যা আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। এ অধ্যয়নে আমার সবচেয়ে বড় লাভ এটাই হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও মতামতকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া উচিত নয় বলে নতুন করে উপলব্ধি করলাম। কুরআন হাদীসের দলীল ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা ছাড়া কারো মতামত গ্রহণ করা সঠিক নয় বলে মাওলানা মওদূদী নিজেই যে শিক্ষা দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা আরও ভালভাবে বুঝে নিলাম।

কিন্তু একটি বিষয়ে মনে বড়ই বেদনা বোধ করলাম যে, সমালোচনা করতে গিয়ে বা ফতোয়া দেবার প্রয়োজনে মাওলানার কিতাবাদি থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে সততা, সত্যনিষ্ঠা ও ইনসাফের পরিচয় কমই পাওয়া গিয়েছে। এর যে বিভিন্ন ধরণ লক্ষ্য করেছি এর কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ ঃ

১। কোথাও পূর্বাপর (সিয়াক ও সাবাক) কিছু কথা বাদ দিয়ে এমন অংশটুকু তুলে দেয়া হয়েছে যা পড়লে সত্যিই অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়। অথচ মূল বই পড়লে ঐ আপত্তির কিছুই বাকী থাকে না।

২। কোথাও মাওলানার বই থেকে এমন বাক্য তুলে ধরা হয়েছে যা মাওলানার নিজের কথা নয়। তিনি কোন লোকের কথা আলোচনা প্রসংগে তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তা "মাওলানার বইতে আছে" এ যুক্তি দেখিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

৩। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, কোথাও মাওলানার বাক্য হুবহু নকল না করে কোন শব্দ যোগ বা বিয়োগ করে উদ্ধৃত করা হয়েছে যার ফলে বাক্যটির মর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। যেমন সম্ভব শব্দকে অসম্ভব লেখা হয়েছে। তারপর ঐ বিকৃত অর্থবিশিষ্ট বাক্যটিকে মাওলানার কথা হিসাবে পেশ করে সমালোচনা করা হয়েছে।

৪। খুতুবাত বইটি মাওলানার জুমআর বক্তৃতার সংকলন। তিনি মুসল্লিদেরকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এসব ফরয পালন না করলে ঈমানের দাবী করা চলে না বলে নসীহত করেছেন। এখানে আকায়েদের মাসলার হাওয়ালা দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে যে, মাওলানা বেআমল মুসলমানকে কাফের মনে করেন।

৫। এ রকম যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে যে, কোন একটি কথা মাওলানা যে উদ্দেশ্যে বলেছেন, তা অগ্রাহ্য করে অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে তা আপত্তিকর বলে প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। এমনকি কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ঐ মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আমি এসব ফতোয়া ও সমালোচনার পুস্তক-গুলোতে উদ্ধৃত প্রায় কথার সাথেই মূল বইয়ের কথার কোন মিল পাইনি। যেখানে মিল পেয়েছি সেখানেও মাওলানার বক্তব্যকে কদর্য করা হয়েছে। যেসব সমালোচনা আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ মনে হয়েছে সেসব বিষয় এমন নয় যার কারণে কাউকে গুমরাহ, ফাসেক বা বেঈমান বলা যায়।

আমার এ অভিজ্ঞতার দু' একজন সাক্ষীর কথা উল্লেখ করছি

১। ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুদাররিস মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের অনুরোধে ব্যারিষ্টার মাওলানা কুরবান আলী মাওলানা মওদূদীর লেখা উর্দু তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" এর ৬টি খণ্ড নিয়ে উক্ত মাদ্রাসায় হাযীর হন। মাদ্রাসার মুদাররিসগণ নিজ নিজ নোট বই থেকে আপত্তিকর উদ্ধৃতি পেশ করতে থাকেন। ব্যারিষ্টার সাহেব তাফসীরের কিতাবের সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে শুনাতে থাকেন। যে কয়টি উদ্ধৃতি পেশ করা হয় তার কোনটিই মূল কিতাবের সাথে মিলাবার পর দূষণীয় বলে প্রমাণিত হয়নি।

তখন তাফসীরের সব কয়টি খণ্ডই মুদাররিসগণ কিছুদিন দেখার জন্য মাদ্রাসায় রেখে দেন। পরে যখন ব্যারিষ্টার সাহেবকে কিতাবগুলো ফেরৎ দেয়া হয় তখন তাঁকে জানানো হয় যে তেমন কোন আপত্তিকর কথা পাওয়া যায়নি।

২। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসে চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল করীম সাহেব আমার বাড়িতে তশরীফ আনেন। সেখানে দেওবন্দের ফারেগ একজন মুহাদ্দিস তাঁর নোট বই থেকে একে একে তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করেন। আমি মূল বই-এর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা পড়ার জন্য সেখানে উপস্থিত মাওলানা মাযহারুল হক (দেওবন্দী) সাহেবকে অনুরোধ করি, প্রতিটি উদ্ধৃতি পেশ করার পর উপস্থিত সবাই তা বেশ আপত্তিকর বলে অনুভব করে একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু মূল বই থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ার পর একটু রাগত স্বরে এবং উচ্চ কণ্ঠে পীর সাহেব বলে উঠলেন এর মধ্যে আপনি কী দোষ পেলেন যার জন্য এটা নোট করে রেখেছেন?

এ সব কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ওলামায়ে কেরাম যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মাওলানার কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন তাহলে ঐ সব

ফতোয়া ও সমালোচনা সঠিক পাবেন না। অবশ্য মাওলানার লেখায় ভুল-ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা তাঁর ভুল দেখিয়ে দিলে দ্বীনের বিরাট খেদমত হবে। ভুল ধরিয়ে দিলে প্রকাশকগণ তা সংশোধন করার সুযোগ পাবেন। লক্ষ লক্ষ লোক যার বই পড়ে দ্বীনের আলো ও ঈমানের স্বাদ পাচ্ছে তারা ফতোয়া ও গালী-গালাজ যারা দিয়েছেন তাঁদেরকে কেমন করে শ্রদ্ধা করবেন ?

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী উর্দুতে "মাওলানা মওদূদী পর এতেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামক দু'খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে অত্যন্ত আদবের সাথে চমৎকার আলেমানা শানে ঐ সব ফতোয়া ও সমালোচনার আলোচনা করেছেন এবং মাওলানার বিরুদ্ধে যেসব প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক নয় বলে স্বার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রচারিত পুস্তিকাগুলোতে এমন কয়েকজন বড় আলেমের নাম রয়েছে যাদের প্রতি আমি তাদের দ্বীনি খেদমতের কারণে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি। একটি ঘটনা থেকে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, তাঁরা হয়তো নিজেরা মাওলানার বই পড়ে ফতোয়া দেননি।

এ ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

এক ব্যক্তি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভীর (রঃ) লেখা বই থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেবের নিকট ফতোয়ার জন্য পাঠায়। সে ব্যক্তি ঐ উদ্ধৃত অংশের লেখকের নাম উল্লেখ করেনি। দেওবন্দ থেকে এ জাতীয় উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনেক ফতোয়া প্রকাশ পেয়েছে। মুফতী সাহেব হয়তো ধারণা করলেন যে, ঐ উদ্ধৃতিটি মাওলানা মওদূদীরই হবে। তাই নানুতুভী সাহেবের লেখার উপরও কঠোর ভাষায় ফতোয়া লিখে পাঠালেন। যে ব্যক্তি ঐ উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন তিনি ঐ ফতোয়া পোষ্টার আকারে ছাপিয়ে দিলেন। তাতে ঐ উদ্ধৃতিটি যে কার সে নামও প্রকাশ করলেন। ফলে মুফতী সাহেব চরম বেকায়দায় পড়লেন।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে দেওবন্দ থেকে ফতোয়ার সিলসিলার পটভূমি উল্লেখ করলে এ জাতীয় ফতোয়ার হাকীকত বুঝা যাবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হয় তাঁর ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪টি প্রদেশ ছাড়া আর সব প্রদেশে কংগ্রেস শাসন কায়েম হয়। এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস শাসিত এলাকার মুসলমানদের প্রতি যে সাম্প্রদায়িক আচরণ প্রকাশ পেল তার ফলে ভারতের দশ কোটি

মুসলিম তীব্রভাবে অনুভব করলো যে, অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি মুসলমানদেরকে তাদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় মনে করে এবং তাদেরকে পদানত করে রাখতে চায়। মুসলিম জাতির এ তিক্ত অনুভূতির ফলেই ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনেই শেরে বাংলা এ. কে. ফযলুল হক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন যাতে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও মুসলিম জাতিকে পরাধীন হয়ে থাকতে না হয়। সর্বসম্মতভাবে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবই ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব" নামে খ্যাত, যার ফসল আযাদ পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ। এ প্রস্তাবটিরই অপর নাম "পাকিস্তান প্রস্তাব"।

মুসলিমগণ এক আলাদা জাতির এ দাবী মিঃ গান্ধী ও মিঃ নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল কিছুতেই মানতে রাযী ছিল না। কংগ্রেসের বিরোধিতা মুসলিমদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং এতে মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্য আরও মযবুত হতে থাকল কিন্তু বড় সমস্যা সৃষ্টি করলো জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা ও দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মাদানীর (রঃ) ভূমিকা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যবদ্ধ না থাকলে বৃটিশের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। এটুকু রাজনৈতিক বিশ্বাস কোন আপত্তির বিষয় ছিল না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শুরুতে লাহোর শাহী মসজিদে প্রদত্ত বক্তৃতায় মাওলানা মাদানী ইসলামের দলীল পেশ করে দাবী করলেন যে, ভারতের হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বুদ্ধ, খৃষ্টান সবই এক কওম। এ বক্তৃতাটি "মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম" নামে পুস্তিকাকারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আল্লামা ইকবাল তখনও বেঁচে ছিলেন। এ বক্তৃতার খবর শুনে এ স্বভাব কবি সংগে সংগে ফার্সী ভাষায় এক কবিতার মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

১৯৩৯ সালে মাওলানা মওদূদী এ বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় "সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" যে কুরআন হাদীস ও রাসূল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী সে কথা বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে "মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত" নামে উর্দু ভাষায় এক মৌলিক পুস্তক রচনা করেন। বাংলায় অনূদিত এ পুস্তকটির নাম "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" মুসলিম লীগের "টু নেশন থিউরী" "দ্বিজাতি তত্ত্বের" পক্ষে এ বইটি অত্যন্ত মযবুত হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়। মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীগণ এ বইটির সাহায্যেই জমিয়তে

ওলামায়ে হিন্দের মুকাবিলা করেন। এ বইটির কারণে মাওলানা মাদানীর (রঃ) ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়।

মাওলানা মাদানী (রঃ) একজন বিখ্যাত পীরও ছিলেন। সারা ভারতে বহু ওলামা তাঁর মুরীদ ছিলেন। মুরীদগণ স্বভাবতঃ পীরকে গভীরভাবে মহব্বত করেন এবং পীরের দোষক্রটি ও ভুলভ্রান্তি অন্য কেউ প্রকাশ করলে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে দেওবন্দের মুফতীর নিকট পাঠাবার সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। মাওলানা মওদূদীর উক্ত পুস্তকের প্রতিক্রিয়ায় দেওবন্দে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার ফলে ফতোয়া জারী হতে লাগল। আমার ধারণা যে মুফতীগণ যদি উদ্ধৃত অংশের উপর নির্ভর না করে মূল বই পড়ে যাচাই করে দেখতেন তাহলে এমনভাবে ফতোয়া দিতে পারতেন না।

"মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি"—এ পর্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনার প্রসংগ উত্থাপন করে একথাই প্রমাণ করতে চাই যে, ইলমী সমালোচনা দ্বারা মাওলানা মওদূদীকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত আমি যত সমালোচনা পড়েছি তার মধ্যে মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী ও মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (রঃ) লেখাতেই ইলমী শালীন মান পেয়েছি। এ দুজন ফতোয়ার ঢং বা অশালীন ভাষায় লিখেননি। মাওলানা মওদূদী আমার এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেছেন যে, তিনি চিঠি পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ) ও মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (রঃ) পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁর কোন কোন লেখা সংশোধন করেছেন এবং কোন কোন পয়েন্টে তাঁর বক্তব্য সঠিক বলে ঐ দুজনকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রসংগক্রমে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম লীগের "টু নেশন থিওরী" ও "পাকিস্তান আন্দোলনের" পক্ষে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), মাওলানা সাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ), মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফীর (রঃ) মতো ওলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন না করলে মুসলিম জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর হতো না।

মাওলানার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

মাওলানার চিন্তাধারা ও ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছে তারা মাওলানাকে কতটা মহব্বত ও শ্রদ্ধা করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব,

সম্মোহনী চেহারা ও বলিষ্ঠ বাচনভংগী এমন ছিল যে তাঁকে সমীহ্ করাই স্বাভাবিক ছিল।

এ সত্ত্বেও মাজলিসে শুরার বৈঠকে তাঁকে কোন সময় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটাতে দেখিনি। শুরার সদস্যদের অবাধ ও স্বাধীন বক্তব্য ধৈর্যের সাথে শুনতেন। এমন কি তাঁর নিজের মতকে যুক্তি সহ্কারে খণ্ডন করতে শুরা সদস্যগণকে নির্ভীকভাবে বক্তব্য রাখতে দেখেছি। নিজের মত পরিত্যাগ করার সাহস ও যোগ্যতা থাকার ফলে তাঁর নেতৃত্ব কখনও সংকটের সম্মুখীন হয়নি।

১৯৫৭ সালে মাজলিসে শুরায় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মত বিরোধ দেখা দেয়। শুরার এক-চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচনে অংশ নেবার বিরুদ্ধে অটল থাকেন। মাওলানা ইচ্ছা করলে ভোটের জোরে তাদের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারতেন। কিন্তু এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে অভ্যস্ত থাকায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য রুকন সম্মেলন আহ্বান করেন। বাহাওয়ালপুরের মাছিগোট নামক স্থানে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা সঠিক মনে করলেন না। যেহেতু তিনি উক্ত প্রশ্নে একটি বিশেষ মতে দৃঢ় সেহেতু করাচীর আমীর গোলাম মুহাম্মদ চৌধুরীকে সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। যারা নির্বাচনের বিরোধী তাদেরকেই বক্তব্য রাখার জন্য প্রথমে সুযোগ দেয়া হয়। তাঁদের মধ্য থেকে দু'জন প্রত্যেকে তিন ঘন্টা করে বক্তব্য রাখলেন। উভয় বক্তা মাওলানার সাহিত্য মন্থন করে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করতে থাকলেন। তাঁরা জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানার লেখা উদ্ধৃত করে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে নির্বাচনে যাবার সাংগঠনিক, আদর্শিক ও বাস্তব প্রস্তুতির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে বলে তাঁরা দৃঢ় মতামত প্রকাশ করলেন। তারা দুজন তিন ঘন্টা করে মোট ছয় ঘন্টা বক্তৃতা করলেন। আমি মাওলানা মওদূদীর একেবারে পাশেই বসে ঐসব বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া তাঁর চেহারায় তালাশ করছিলাম। তিনি একইভাবে ধীর চিত্তে বক্তৃতা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে পান ও জর্দা মুখে দিচ্ছিলেন। চেহারায় সামান্য বিরক্তির লক্ষণও ছিল না।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে বক্তব্য রাখার শুরুতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে অপর পক্ষ যতটুকু সময় নিয়েছেন এর চেয়ে বেশী সময় তিনি নেবেন

না। দু কিস্তিতে তিনিও ছয় ঘন্টায় তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি বাংলায় "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কার্যসূচী" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

মাওলানার বক্তৃতা সমাপ্ত হবার পর সম্মেলনে উপস্থিত রুকনগণের রায় নেয়ার পূর্বে মাওলানাই প্রস্তাব করলেন যে অপর পক্ষের বক্তব্য যারা সমর্থন করেন তাদেরকে পয়লা রায় দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। সভাপতি এ প্রস্তাবের পক্ষে রুকনদের সম্মতি আছে বলে অনুভব করে যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার পক্ষে, তাদেরকে হাত তুলতে বললেন। ৯৩৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৮ জন হাত তুললেন। এত বড় একটা বিতর্কিত বিষয়ে এত শান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। পরাজিত পক্ষকে হেয় করার জন্য বা মাওলানার বিজয়ের উল্লাস প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন শ্লোগান হলো না। মাওলানার চেহারায়ও বিজয়ের উচ্ছাস তালাশ করে পেলাম না। বুঝতে পারলাম যে আত্মপ্রত্যয়ী নেতার বলিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বাহ্যিক কোন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

দেশের অনেক বড় বড় নেতাকে মাওলানার সাথে আলোচনা করতে দেখেছি। মাওলানার ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। ১৯৬৯ সালে আউয়ূব খানের সাথে আট দলীয় জোটের (Democratic Action Committee-DAC) নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠকে জামায়াতের পূর্ব-পাক প্রতিনিধি হিসাবে আমিও অংশগ্রহণ করেছি। আইয়ূব খান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি মুরশিদ, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মাওলানার সাথে হাত মিলাবার বা তাঁর সাথে আলোচনা করার সময় লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা মাওলানার ব্যক্তিত্বকে কতটা গুরুত্ব দিতেন।

DAC কর্তৃক রচিত আট দফা দাবীর ভিত্তিতে আইয়ূব খান ৮-দলীয় জোটকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ এ জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজীব ৬-দফা মেনে নেবার জন্য চাপ দেবার ফলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায় এবং গণতন্ত্র ঘরের দুয়ারে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয় যার ফলে ইয়াহইয়া খানের মার্শাল ল' জারী হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের এক পর্যায়ে লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাড়ীতে আট দলীয় জোটের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬-দফা নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হলে আমি শেখ মুজীব ও তাজুদ্দীন সাহেবদ্বয়কে বললাম,

গোলটেবিল বৈঠকে জোটের আট দফা গৃহীত হলে গণতন্ত্র হাতে পেয়ে যাব এবং এতে আপনারাই সবচাইতে বেশী লাভবান হবেন। ৬-দফার জন্য চাপ দিলে গোলটেবিল বৈঠক তো ব্যর্থ হবে, DAC-এর জোটও ভেংগে যাবে।" আমার কথা শুনে শেখ সাহেব বললেন যে, মাওলানা ভাসানীকে জোটের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তিনি আসলেন না। আমার জন্য মাওলানা সমস্যা সৃষ্টি করবেন যদি ৬-দফা বাদ দেই।

আমি বললাম "চলুন এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনা করি।" সংগে সংগে তিনি মাওলানার কাছে যেতে প্রস্তুত হলেন। জামায়াতের গাড়ীতেই শেখ সাহেব ও জনাব তাজুদ্দীনকে নিয়ে মাওলানার বৈঠকখানায় পৌঁছলাম। উর্দু ও ইংরেজীর মিলিত ভাষায় শেখ সাহেব গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বললেন, "মাওলানা সাহেব"মেহেরবানী করে আমার সমস্যাটা উপলব্ধি করুন। মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করে বাইরে হৈ চৈ করছেন যাতে বৈঠক ব্যর্থ হয়। আপনি তাকে চেনেন না। তিনি আমার দলের নেতা ছিলেন বলে তাঁকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। ১৯৬৫ সালে যখন আমি ৬ দফা পেশ করি তখন এ মাওলানাই সবার আগে এর চরম বিরোধিতা করেন। আমার জেলে আটক থাকাকালে যখন ৬-দফা দাবী জনপ্রিয় হয়ে গেল তখন এ ধূর্ত মাওলানা ৬-দফার সাথে আরও ৫-দফা যোগ করে ছাত্রদেরকে সহ ১১-দফা আন্দোলন গড়ে তুললেন। এখন আমি এমন বেকায়দায় পড়েছি যে তিন বছর জেলে থাকার পর ৬-দফা বাদ দিয়ে ময়দানে নামতেই পারব না।"

একটু থেমে বললেন, "এই অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর যুক্তি নিয়ে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একইভাবে ৬-দফার সমালোচনা করছেন। এতে আমার ক্ষোভ নেই। কিন্তু (উত্তেজিত হয়ে) এই ধুরন্ধর মাওলানার কোন নীতি নেই। তিনি রাজনৈতিক ময়দানে আমার জন্য কেবলই সমস্যা সৃষ্টি করছেন। মাওলানা সাহেব, মেহেরবানী করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনি ৬-দফা মেনে নিলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমি চীনপন্থী ঐ এজেন্টকে দেশছাড়া করে ছাড়ব।"

শেখ সাহেবকে তখন খুব অসহায় মনে হলো। মাওলানা মওদূদী এতক্ষণ ধৈর্যের সাথে তাঁর কথা শুনছিলেন। একজন অভিজ্ঞ মুরুব্বীর মত স্পষ্ট ভাষায় শেখ সাহেবকে বললেন ঃ

"এ বিষয়ে আমি একমত যে মাওলানা ভাসানী ও মিষ্টার ভুট্টো চান যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হোক এবং গণতন্ত্র আমাদের হাতে না আসুক।

DAC-এর আট দফার ভিত্তিতেই গোলটেবিল বৈঠক বসেছে। আইয়ূব খানের সাথে ৮-দলীয় জোটের এ বৈঠককে সফল করতে পারলে মাওলানা ভাসানী ও মিষ্টার ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনি যা বলছেন তা করলে ভাষানীর উদ্দেশ্যই সফল হবে। এটা ভাসানীকে উৎখাত করার পথ নয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফলতার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে একনায়কত্ব উৎখাত হতে যাচ্ছে। ৬-দফার কথা তুলে গোলটেবিল বৈঠককে ভেংগে দিলে আবার সামরিক শাসনই আসবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন।"

মাওলানার এ স্পষ্ট মন্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিমর্ষ হয়ে শেখ সাহেব বিদায় নিলেন। আমি তাদেরকে ইষ্ট পাকিস্তান হাউজে পৌঁছাবার জন্য সাথে গেলাম। পথে জিজ্ঞেস করলাম "মাওলানা সাহেব বলার পর কিছু না বলেই চলে এলেন যে ?" বললেন, "মাওলানা সাহেবের সাথে তর্ক করা চলে না। তিনি চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন।"

১৯৬২ সালের কথা। ৬২ সালে আইয়ূব খান নতুন শাসনতন্ত্র চালু করে দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে নুরুল আমীন, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীসহ ৯ নেতা নতুন শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদেরকে শরীক করার উদ্দেশ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এক ডেলিগেশন মাওলানা মওদূদীর সাথে দেখা করতে গেলেন। মাওলানা সাহেব বললেন, "নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা করেছিলেন। ৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এর কতক ধারা বদলে দেয়া হয়েছে। এখন ঐ কয়টি ধারা সংশোধন করার আন্দোলনই বাস্তব ও সম্ভব। নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আবার গণপরিষদের নির্বাচন প্রয়োজন হবে। এতে গণতন্ত্র অনেক বিলম্বিত হবে।"

একথা বলে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধনীমূলক একটি খসড়া পেশ করে বললেন, "শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য এ খসড়াটি বিবেচনা করে দেখুন।" জনাব হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বিবেচনার জন্য খচড়াটি নিয়ে গেলেন। অতঃপর নতুন শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বদলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলনই চালু হলো।

১৯৬৩ সালের কথা। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান লাহোর গভর্ণর হাউজে মাওলানা মওদূদীকে দাওয়াত দিলেন। তিনি শুরুতেই মাওলানার তাফসীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, "ইসলামকে চমৎকারভাবে পরিবেশন করার

যে যোগ্যতা আল্লাহ্ পাক আপনাকে দিয়েছেন তাতে দল ও মত নির্বিশেষে সবাই আপনাকে উস্তাদ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।"

মাওলানা বললেন, "যদি আমার দ্বারা দ্বীনের কিছু খেদমত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আমি আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া জানাই।"

আইয়ূব খান বললেন, "মাওলানা সাহেব ! আমি অত্যন্ত ভক্তির সাথে আপনার খেদমতে আরয করছি যে, আপনার মতো একজন মহান দ্বীনি ব্যক্তিত্ব দলীয় রাজনীতির উর্ধে থাকলে সকল দলের নিকটই আপনি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবেন। আপনি তো জানেন যে, রাজনৈতিক অংগনটা বড়ই কলুষিত। আশাকরি আমি যে ইখলাসের সাথে একথা বললাম তা আপনি উপলব্ধি করছেন।"

মাওলানা বললেন, "আপনি কি চান যে, রাজনৈতিক ময়দানটা কলুষিত থাকুক ?" আইয়ূব খান বিব্রত হয়ে বললেন, "মাওলানা ! আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করছি ক্লীন পলিটিক্স চালু করতে।" মাওলানা বললেন, "এ চেষ্টা কি সবারই করা কর্তব্য নয় ? আমি সে চেষ্টাই করছি। এ দায়িত্ব পালন করা থেকে যদি আমি বিরত থাকি তাহলে আল্লাহ্র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব বলুন ?"

আইয়ূব খান একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, "আপনার ইসলামী সাহিত্যের একজন ভক্ত হিসাবে আপনার সাথে সাক্ষাত করাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আপনি মেহেরবানী করে সে সুযোগ দান করায় আমি শুকরিয়া জানাই। কথায় কথায় আমি যা বলেছি তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না বলেই আমি আশা করি ।"

একথার পর অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে মাওলানার সাথে হাত মিলায়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মাওলানা মওদূদী যে কত বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এসব ঘটনা এর উজ্জ্বল প্রমাণ। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর মতো দলীয় প্রধানগণকে মাওলানার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করতে আমি দেখেছি। এসব নেতৃবৃন্দ PDM বা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের নামে সমগ্র পাকিস্তানে আইয়ূবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সফর করেন। আমিও তাদের সাথে ব্যাপক সফর করেছি। মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনারত অবস্থায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, তারা যেন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করছেন।

লাহোর জেলে দু' মাস

১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক চলাকালে শেষরাতে পুলিশ মাওলানা মওদূদীর বাড়ী, জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস ও মেহমানখানা ঘেরাও করে ফেলে। ঘুম থেকে অসময়ে জাগতে হলো। জানা গেল যে জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে এবং সারা পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মাজলিসে শুরার সদস্যদেরকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হচ্ছে। ৫০ জন শূরা সদস্যের মধ্যে কর্মপরিষদের ১২ জন সদস্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাওলানা আবদুর রহীম ও আমি ঐ সময় লাহোরে কর্মপরিষদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। তাই মাওলানা মওদূদী ও পশ্চিম পাকিস্তান শূরা সদস্যগণের সাথে আমরা দু'জনও সেখানেই গ্রেফতার হলাম।

লাহোর ডিস্ট্রিক্ট জেলে তিন কামরা বিশিষ্ট সেলে আমাদেরকে রাখা হলো। মাওলানা মওদূদী এক কামরায় আর বাকী ৮জনকে দুটো কামরায় থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একটি লম্বা বারান্দা ঐ তিনটি কামরার সামনে ছিল এবং বারান্দাটি লোহার সিক দিয়ে আবদ্ধ ছিল। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বারান্দায় তালা লাগিয়ে রাখা হতো। কামরার দরজায় তালা দেয়া হতো না। আমরা অবাধে সব কামরায় যেতে পারতাম এবং বারান্দায় পায়চারী করতে পারতাম।

একটানা দুমাস মাওলানার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে থাকার দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জানাই। লাহোর জেলে আটকে রাখায় পরিবার পরিজনের দেখা না পাওয়ায় আইয়ূব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও মাওলানার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাওয়ায় মনে সরকারের প্রতি শুকরিয়ার ভাবও সৃষ্টি হলো। সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই মিয়া তোফাইল মুহাম্মদ ও জনাব নাঈম সিদ্দিকীকে করাচি জেলে নিয়ে যাওয়ায় মাওলানার সাথে আমরা ৫জন রয়ে গেলাম। আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম এক কামরায় এবং অন্য কামরায় রইলেন লাহোরের আমীর মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয, সেক্রেটারী জনাব গোলাম জিলানী ও লাহোর থেকে নির্বাচিত শূরা সদস্য মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ।

আমরা ৫ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায় করতাম। আমি আযান দিতাম আর মাওলানা মওদূদী ইমামতি করতেন। সকালে নাস্তার পর মাওলানা দারসে কুরআন পেশ করতেন এবং বিকালে দারসে হাদীস দিতেন। দারসের পর প্রশ্ন করার প্রচুর সময় পাওয়া যেতো। নাস্তা ও দু'বেলা এক সাথে

খাওয়ার সময় সব রকম আলাপই চলতো। দু' মাস আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কত বিষয়ে যে জ্ঞানের স্বাদ পেয়েছি তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। মনে যত প্রশ্ন ছিল সবই জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাওয়ায় আমি অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করছিলাম।

এ দু' মাসের মধ্যে একমাস রমযান ছিল। মাওলানা নাসরুল্লাহ্ খান আযীয যে হাফেযও ছিলেন যে কথা আগে জানা ছিল না। মাওলানা এশার নামাযে ইমামতী করার পর তারাবীহ্ পড়াবার জন্য হাফেয সাহেবকে দায়িত্ব দিলেন। তিনি পয়লা দিন আধা পারারও কম পড়লেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি কুরআন খতম করার দায়িত্ব নিতে সাহস পেলেন না। মাঝে মাঝে একটু বেশী পড়তেন। যেদিন তিনি পড়তে চাইতেন না সেদিন আমাকেই তারাবীহ পড়াতে হতো। মাওলানা আঃ রহীম পড়াতে রাযী হননি।

মাওলানার দারস শুনতে এমন তৃপ্তিবোধ হতো যে এক ঘন্টা সময় কোথা দিয়ে চলে গেল টেরও পাওয়া যেতো না। দারসের পর প্রশ্ন করার মাধ্যমে আরও জ্ঞানের খোরাক যোগাড় করার সুযোগ হতো। দারসের সময় বেশ বড় আকারের যে কিতাব তাঁর সামনে থাকতো এমন কিতাব আর কখনো দেখিনি। আয়াত সমূহের তিনদিকে যথেষ্ট জায়গা খালি রয়েছে যেখানে তিনি ছোট ছোট অক্ষরে টিকা লিখে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, তিনি বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন কালে জরুরী সব নোট এসব খালি জায়গায় লিখে নিয়েছেন। এখন তিনি এ নোট দেখেই তাফসীর লিখছেন।

তাফহীমুল কুরআন পড়ে যে মজা পাওয়া যায় তার চেয়ে মাওলানার মুখে দারস শুনে যে কত বেশী তৃপ্তি বোধ হতো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর দেয়া দারসের আয়াতগুলো বারবার পড়তে মনে চাইতো এবং পড়ার সাথে সাথে তাঁর শেখান তাফসীরও মনে এসে যেতো। তাই কুরআন দেখে তেলাওয়াত করার পর মুখস্থ আওড়াবার ইচ্ছা হতো। এরই ফলে যত বেশী সম্ভব কুরআন মুখস্থ করতে লাগলাম।

জেলখানায় রাতে আলো কম থাকায় পড়াশুনা করা কঠিন ছিল। তখন তালাবদ্ধ বারান্দায় পায়চারী করে মুখস্ত করা সূরাগুলো আওড়াতে থাকতাম। মাওলানার কামরা বরাবর পৌঁছলে বন্ধ দরজার উপর দিকের আয়না দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। প্রায়ই তিনি এ সময় ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কুরআনের আয়াত গুণ গুণ স্বরে আওড়াতে থাকতেন।

নাস্তা ও খাওয়ার সময় সবাই খাবার চারপাশে গোল হয়ে বসতাম। এ সময় মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক ঘটনা

বা গল্প বলতেন। মাওলানা ফাঁকে ফাঁকে কুরআনের আয়াতের টুকরা এমন চমৎকারভাবে পেশ করতেন যে সবাই তৃপ্তির সাথে তা উপভোগ করতেন। যেমন আমরা কমলা, আপেল ও অন্যান্য ফলের খোসা ছাড়িয়ে একদিকে আসল ফল ও আর একদিকে খোসা আলাদা করে রাখতে দেখে তিনি ঐ দুদিকে ইশারা করে বললেন, "মাতায়াল লাকুম ওয়ালে আনয়ামিকুম।" অর্থাৎ এগুলো তোমাদের খাবার, আর খোসাগুলো তোমাদের গৃহপালিত পশুর খাবার।

হাড় থেকে গোশত ভালভাবে না খেয়ে ফেলে দিলে বললেন, "কুলু ওয়াশরাবু ওয়াল তুসরিফু।"—খাও ও পান কর, অপচয় করো না। সব কথা মনে নেই, মাওলানা যে কুরআনকে কতটা আয়ত্ব করেছিলেন তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম।

জেলখানার ডাক্তার রোজই একবার মাওলানার কামরায় এসে কিছুক্ষণ বসতেন। বয়সে যুবক, দেখতে সুপুরুষ, আলাপে পটু বলে ডাক্তার এলেই আমি মাওলানার কামরায় হাযীর হতাম। ডাক্তার সাহেব মাওলানাকে এত মহব্বত করার কারণ জানা গেল যে ছাত্র জীবনে তিনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ডাক্তারও মাওলানার জ্ঞান সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতেন এবং এর জওয়াব থেকে আমিও উপকৃত হতাম।

একদিন ডাক্তার সাহেব মাওলানাকে বললেন, "আপনার এ কামরায় অনেক রাজনৈতিক নেতাকে থাকতে দেখেছি। কিন্তু আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে আরাম-আয়েশের কোন দাবী বা কোন জিনিসের প্রয়োজনের কথা কখনও বলেন না বলে জেলের কর্মকর্তারা বিস্ময় প্রকাশ করেন।" মাওলানা বললেন, "যারা আমার আযাদী হরণ করে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে এমন যালেমদের কাছে আমার আর চাইবার কী আছে ? বন্দীদশা থেকে মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। জেল কর্তৃপক্ষ তো সরকারের হুকুমের গোলাম। আমি যা চাই তা তো দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই এদের কাছে কী চাব ?"

ডাক্তার সাহেব বললেন, "এ কামরায় কিছুদিন পূর্বে খান আবদুল কাইয়ুম খান ছিলেন। এয়ার কণ্ডিশন দেয়ার দাবী করার পরও না পাওয়ায় গরমের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শিশুর মতো কাঁদলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দিয়ে বের হয়ে গেলেন।" মাওলানা মন্তব্য করলেন, "খান সাহেব হাজার হাজার রাজবন্দীকে জেলে দিয়েছেন। সেখানে মানুষের কেমন কষ্ট হয় তা এই পয়লা জানতে পারলেন।"

একদিন একজন সার্ভে অফিসার এসে মাওলানার সাথে দেখা করলেন। দাঁড়ি টুপী ও চেহারা দেখে দ্বীনদার লোক মনে হল। আমি আগ্রহ সহকারে এগিয়ে গেলাম। তিনি জেলে এসেছেন সরকারী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই। মাওলানাকে মহব্বত করেন বলে দেখা করতে এসেছেন বলে জানালেন।

ভদ্রলোক সম্প্রতি হজ্জ করে এসেছেন। মক্কা ও মদীনা যিয়ারতের সময় তার মধ্যে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা বেশ জযবার সাথেই প্রকাশ করলেন। মাওলানার চেহারায় ভাবান্তর দেখা গেল। মাওলানা সামান্য আবেগের সাথে বললেন, "কাবা শরীফে হাযীর হওয়া মানে মনিবের দুয়ারে বান্দাহর ধরণা দেয়া। আর মদীনার মসজিদে হাযীর হওয়ার অর্থ হলো, পিতার কোলে সন্তানের আশ্রয় গ্রহণ।" এটুকু বলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

সাধারণতঃ মাওলানার কথা ও চেহারায় কোন সময় আবেগ প্রকাশ পায় না। মনে হয় তখনই পয়লা আবেগ লক্ষ্য করলাম। ভাবলাম খাঁটি সৈয়দযাদার সত্যিকার আবেগই প্রকাশ পেল।

জেলখানায় দু'মাস মাওলানা মুহতারামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার মধুর স্মৃতি আমার অন্তরে চিরকাল অম্লান থাকবে। ১৯৬৯ সালে মাজলিসে শূরার অধিবেশনের পর কিছুদিন মাওলানার কাছে থাকার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেশে তখন আইয়ূবের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হওয়ায় আমাকে অবিলম্বে ঢাকা আসতে হলো। বিদায় নিতে গিয়ে আফসোসের সাথে মাওলানার কাছে মনোভাব প্রকাশ করলাম। তিনি পরম স্নেহমাখা স্বরে বললেন, "ভাই দুনিয়ায় আমরা যে দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়েছি তাতে একসাথে একটু অবসর নিয়ে বসার অবকাশ পাবেন কোথায় ? ঐ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে থাকুন। যদি আমরা মনিবের সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারি তাহলে জান্নাতে একসাথে অবসর যাপনের সুযোগ হবে।"

মাওলানার নির্ভিকতা

মাওলানা মওদূদীর (রঃ) যে গুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে তা হলো তাঁর অদ্ভূত নির্ভিকতা। তাঁর কাছ থেকেই আমি এ বাস্তব শিক্ষা লাভ করেছি যে যদি একমাত্র আল্লাহকে সত্যিকারভাবে কেউ ভয় করে তাহলে আর কোন ভয়ই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। রাসূল (সা) এ কথাটি কত চমৎকার করে বলেছেন, "যে শুধু আল্লাহকে ভয় করে তাকে

সবাই ভয় করে। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকেও ভয় পায় তাকে সবাই ভয় দেখায়।"

ইতিহাসে অনেক নির্ভিক মনীষীর কাহিনী পড়েছি। কিন্তু তা থেকে আমার মনে এমন নির্ভিকতা সৃষ্টি হয়নি যা মাওলানার বাস্তব উদাহরণ থেকে অনুভব করেছি। এ থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে মানুষের সত্যিকার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার জন্য ইতিহাস যথেষ্ট নয়, বাস্তব উদাহরণ অপরিহার্য। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক শুধু কিতাব নাযিল করাই যথেষ্ট মনে করেননি। নবী পাঠাবার প্রয়োজনও বোধ করেছেন।

১৯৬৩ সালের শেষদিকে আইয়ূব খানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি জেনারেল হাবীবুল্লাহ খান মাওলানা ও জামায়াতের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। তখন কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার অধিবেশন চলছে। শূরা সদস্যদের অনেককেই পেরেশান মনে হলো। মাওলানা আমাদেরকে সতর্ক করে বললেন যে, জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই সবাই যেন এ জন্য প্রস্তুত থাকে এবং অফিসের সবকিছু সামলিয়ে রাখে।

ঐ অবস্থায়ও মাওলানা নিয়মিত বৈকালিক আসরে বসতেন। তাঁকে সামান্য বিচলিত মনে হতো না। জনাব নাঈম সিদ্দীকী আমাকে বললেন, "আমি ব্যস্ততার কারণে অনেকদিন থেকে এ আসরে হাযীর হতে পারছি না। কিন্তু এ কদিন রোজই আসছি। সরকার যেভাবে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলছে তাতে মনে ক্ষোভ, বিদ্রোহ ও অস্থিরতা বোধ করি। মাওলানার কাছে এলে, তাঁর কথা শুনলে ও তাঁর স্বাভাবিক প্রশান্ত চেহারা দেখলে মনের পেরেশানী দূর হয়ে যায়। জামায়াত বিরোধী পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে তখন বৈকালিক আসরে মানুষের ভীড় অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। সবাই পেরেশানী প্রকাশ করতে থাকে। সবাই এ বিষয়ে প্রশ্ন করে "মাওলানা এখন কী হতে যাচ্ছে ? সরকার কী চায় ? জামায়াতের নেতাদেরকে কী গ্রেফতার করবে ? জামায়াতকে বে-আইনী করলে আমরা কী করবো ? এ জাতীয় প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে যে অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল তার জওয়াবে মাওলানা অতি শান্তভাবে সবাইকে হাতে ইশারা করে থামতে বললেন। সবাই মাওলানার জওয়াব শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল। মাওলানা স্বাভাবিক ধীর কণ্ঠে বললেন ঃ

"ভাই, ইসলামী আন্দোলন কোন কালেই বাতিলের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হয়নি এবং কোন যুগেই এ আন্দোলনকে খতম করাও যায়নি। জামায়াতে ইসলামী যখন ১৯৫৩ সালে ক্ষুদ্র সংগঠন ছিল তখনও ফাঁসি ও জেলের

হুমকী এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ঐ বাতিল সরকার খতম হয়ে গেছে। জামায়াত আরও অগ্রসর হয়েছে। আজ যারা জামায়াতকে খতম করতে চেষ্টা করছে তারাও একদিন খতম হবে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে জামায়াত আরও এগিয়ে যাবে।"

একটু থেমে তিনি বললেন, যারা বড় গলায় বিবৃতি ঝাড়ছে তাদের কোন অতীত তো ছিলই না। কোন ভবিষ্যতও নেই। ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়াই এদের একমাত্র পরিণাম। আপনারা পেরেশান হবেন না। যারা বেশী পেরেশান হয় তারা এ পথের চলার যোগ্য থাকে না। সবর করুন ও মজবুত থাকুন।"

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনকে সফল হতে না দেয়াই সরকারের লক্ষ্য ছিল। তাই বিবৃতি ও প্রচারাভিযান চালিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চলছিল যাতে জামায়াত সম্মেলন করতে সাহসই না পায়। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও যখন জামায়াত সম্মেলনের আয়োজন করতেই থাকলো তখন বিভিন্ন প্রকার বাধা সৃষ্টি করলো। সম্মেলন অনুষ্ঠানের উপযোগী কোন মাঠেরই অনুমতি দিল না। জামায়াত অগত্যা লাহোর শহরতলীতে বড় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা খালি জায়গায় দীর্ঘ প্যাণ্ডেল তৈরী করল। তখন মাইকের অনুমতি বাতিল করা হলো। ৩৫ হাজার ডেলিগেটের এ সম্মেলনের জন্য প্রশস্ত মাঠ না পাওয়ায় শ্রোতাদের বসার যে ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ডেলিগেটগণ প্রায় পোয়া মাইল লম্বা ও সামান্য প্রস্থ স্থানে বসতে বাধ্য হলো।

মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী বক্তৃতা ছাপিয়ে নেয়া হলো এবং একটু দূরে দূরে এক একটি উঁচু টেবিলে মুকাব্বিরের মতো লোক দাঁড় করান হলো। যাতে মাওলানার বক্তৃতা চলা কালেই ছাপানো বক্তৃতা পড়ে সবাইকে একসাথে শুনিয়ে দেয়া যায়। বিনা মাইকেই এমন অদ্ভূত ব্যবস্থাপনায় সম্মেলন সফলতার সাথে চলতে দেখে দুশমনদের মাথা খারাপ হবারই কথা। তখন সরকার রীতিমতো গুণ্ডামী শুরু করলো। একদিকে তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। গুলীতে আল্লাহ বখ্‌স নামক একজন কর্মী শহীদ হয়ে গেলেন। একদল সশস্ত্র গুণ্ডা বক্তৃতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলো।

এ রকম পরিস্থিতিতে মাওলানা মওদূদীর নির্ভিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা বিস্ময়কর। মাওলানা ঘোষণা করলেন যে, স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া সবাই বসে বক্তৃতা শুনতে থাকুন। কেউ উঠবেন না। কেউ ঘাবড়াবেন না। পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য ভলান্টিয়ারদেরকে দায়িত্ব

পালন করতে দিন। অন্য সবাই নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে থাকলে গুণ্ডারা কিছুই করতে পারবে না।

আমি মাওলানার পেছনে মঞ্চেই ছিলাম। মাওলানা বক্তৃতা জারী রাখলেন। গুণ্ডাদের যে দলটি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছিল তাদেরকে ভলান্টিয়াররা ঘেরাও করে ফেলল। তখন গুণ্ডারা অস্ত্র উঁচিয়ে মাওলানার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগল। এ অবস্থা দেখে মাওলানাকে দাঁড়ান অবস্থা থেকে বসে পড়ার জন্য একজন দায়িত্বশীল উচ্চ স্বরে অনুরোধ করলেন। মাওলানা বলিষ্ঠ আওয়াজে "আমিই যদি বসে যাই তাহলে কে দাঁড়িয়ে থাকবে" কথা বলেই তাঁর বক্তৃতা চালু রাখলেন।

ভলান্টিয়াররা গুণ্ডাদেরকে শান্ত করতে সক্ষম হলেন এবং তাদেরকে ঘেরাও করে দূরে নিয়ে গেলেন। সম্মেলনের কার্যক্রম চলতে থাকল এবং মাওলানার বক্তৃতা মুকাব্বিরদের মাধ্যমে সবাই শুনতে সক্ষম হলেন। মাওলানার নির্দেশ মুতাবিক ভলান্টিয়াররা শান্তভাবে কাজ করার ফলে সম্মেলনে কোন বিশৃংখলা দেখা দেয়নি। এমন কি মহিলাদের তাঁবুতেও কোন আতংক সৃষ্টি হয়নি। হাজার হাজার ডেলিগেট মাওলানার নির্দেশ মেনে চুপ করে বসে থাকায় এবং গুণ্ডাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেবার বদলে শান্তভাবে বিদায় করতে সক্ষম হওয়ায় সম্মেলন পূর্ণরূপে সফল হয়ে গেল। নেতার সাহস ও মনোবল, নেতার আনুগত্য, কর্মীদের বিস্ময়কর শৃংখলা বোধ ও স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মকৌশল দেখে আমি যে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা পেলাম তা আন্দোলনের জীবনে আমার অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

১৯৫৩ সালে সামরিক আদালত মাওলানাকে একটা অজুহাতে ফাঁসির হুকুম দেবার পর তিনি যে নির্ভিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আকারে পেয়েছিলাম। আর সম্মেলনে তা নিজের চোখে দেখলাম। ফাঁসির কুঠরীতে থাকাকালে মাওলানার বড় ছেলে ওমর ফারুক (তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র) পিতার সাথে দেখা করতে গেল। কুঠরীর লোহার শিক ধরে ছেলেটি অঝোরে কাঁদতে থাকল। পিতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। শুধু চোখের পানিতে মনের ভাব প্রকাশ পেল। শিকের ফাঁক দিয়ে পিতা হাত বের করে রোদনরত সন্তানের মাথায় হাত রেখে স্নেহের পরশ মেখে অতি ধীর ও শান্ত স্বরে যা বললেন তা একমাত্র এমন লোকের মুখ থেকেই বের হতে পারে যিনি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সামান্য ভয়ও করেন না এবং যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ ছাড়া মওতের ইখতিয়ার আর কারো হাতে নেই।

তিনি বললেন, "বাবা, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। হায়াত ও মওতের ফায়সালা আসমানেই হয়, যমীনে হয় না। আমার মনিব যদি মওতের ফায়সালা করে থাকেন তাহলে আমি হাসিমুখে ও খুশী মনে তাঁর কাছে চলে যাব। তোমাদেরকেও তাতে রাযী থাকা উচিত। আর যদি তিনি এ ফায়সালা না করে থাকেন তাহলে মনে রেখ যে, দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। যারা ফাঁসির হুকুম দিয়েছে তারা উল্টো শাস্তি পেতে পারে। তারা আমার কিছুই করতে পারবে না।"

মাওলানার দূরদর্শিতা

যুবক বয়সেই তাঁর দূরদর্শিতার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। ২৪/২৫ বছর বয়সে লেখা তার গবেষণা গ্রন্থ "আল জিহাদ ফিল ইসলামে" "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পোলাণ্ড থেকে শুরু হবে" বলে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী দূরদর্শিতারই প্রমাণ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে যে সিদ্ধান্ত লাহোর প্রস্তাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য যদি ইসলামী নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে এর উদ্দেশ্য সফল হবে না। একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তা ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবে না। লেবু গাছে যেমন আম ধরে না, তেমন এ জাতীয় মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হবে না।

তিনি ঐ বক্তৃতায় আরও বলেন যে, ঐ জাতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনকে অমুসলিম রাষ্ট্রের কর্তাদের চেয়েও বেশী নির্দয়ভাবে দমন করতে চেষ্টা করবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের সরকার শুধু কারাদণ্ড দিয়ে দমনের চেষ্টা করাই যথেষ্ট মনে করতে পারে। কিন্তু মুসলিম নামধারী কর্তারা ইসলাম কায়েমের আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ফাঁসির হুকুম দিতেও পরওয়া করবে না। মাওলানার এ বক্তৃতা দেবার ১৩ বছর পর ১৯৫৩ সালে তাঁরই উপর ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলের উপর মন্তব্য প্রসংগে তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার অধিবেশনে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যারা প্রায় সবগুলো আসনে জয়ী হয়েছেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পাননি। তারা যদি চান তাহলে দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সংগঠনকেই পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেন্দ্রীয় জামায়াত এ বিষয়ে তাদের উপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণের

ইখতিয়ার দেয়া সঠিক মনে করে। এ পরামর্শ অনুযায়ীই জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় মাওলানার দূরদর্শিতার আরও অনেক স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নমুনা স্বরূপ পেশ করছি যা এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

ঢাকায় বেশ কয়েকবার বিহারী ও উর্দুভাষী নেতৃস্থানীয়দের সাথে আলোচনা কালে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তারা যেন মুহাজির হিসাবে নিজেদের আলাদা একটি গ্রুপ মনে না করেন। তিনি স্পষ্ট পরামর্শ দিতেন, "আপনারা এখানকার লোকদের সাথে মিশে যান। স্থানীয় লোকদের মেয়ে বিয়ে করুন এবং আপনাদের মেয়েদেরকেও এখানকার অধিবাসীদের কাছে বিয়ে দিন, ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণ স্কুলে পড়তে দিন। আলাদা উর্দু মাধ্যমে পড়লে ভিন্ন জাতি হয়ে পড়বেন। মীরপুর ও মুহাম্মদপুরে আলাদা এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা হওয়া মোটেই সমীচীন হচ্ছে না।

তিনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, যে কোন এলাকার সর্বসাধারণ থেকে ভিন্ন গ্রুপ হিসাবে পৃথক পরিচিতি নিয়ে বসবাস করলে একসময় মারাত্মক পরিণতি দেখা দেয়। আপনারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া নিরাপত্তার উপর নির্ভর করলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

মাওলানার এ সতর্কবাণী যে দূরদৃষ্টির প্রমাণ দেয় তা স্পষ্ট। বর্তমান করাচি ও হায়দারাবাদ শহরে এম. কিউ. এম নামে উর্দুভাষীদের পৃথক দল গঠনের পরিণামে সিন্ধুভাষীদের সাথে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে সংঘর্ষ লেগেই আছে।

মাওলানা এ প্রসংগে রাসূল (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরাতের পর মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এর উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, সরকার যদি ইসলামী হতো তাহলে ঐ আদর্শই অনুসরণ করতো।

মাওলানার সূক্ষ্মদর্শিতা

ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে মাওলানার তাফসীর ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর রচিত বিপুল সাহিত্য তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি সর্বত্রই প্রতিটি বিষয়কে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে তা সাধারণের উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। "ঈমানের হাকীকত" বইটিতে কালেমা

তাইয়েবার ব্যাখ্যা, কালেমা কবুল করার তাৎপর্য, কালেমা গ্রহণকারীর সাথে অন্য লোকের বাস্তব পার্থক্য ইত্যাদির আলোচনায় সাধারণ লোকের বুঝবার উপযোগী এমন সূক্ষ্ম বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যা আলেম সমাজেরও সবার চোখে ধরা পড়ে না।

কুরআন মজীদকে রাসূল (সাঃ)-এর ইসলামী আন্দোলনের দিকনির্দেশনা হিসাবে পেশ করতে গিয়ে তিনি যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। মাওলানার নিকট প্রেরিত অগণিত প্রশ্নমালার জওয়াবের যে সংকলন ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার এত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় নমুনা পাওয়া যায় যা পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সুদ ব্যবস্থার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। মুসলিম সমাজ ব্যাংকের সুদ ব্যবস্থাকে বাধ্য হয়ে জায়েয মনে করা প্রয়োজন বোধ করছিল। কারণ এর বিকল্প ব্যবস্থা আলেম সমাজও দিতে সক্ষম হননি। মাওলানা আকরাম খান ব্যাংকের আধুনিক সুদ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত সুদ-ব্যবস্থা থেকে পৃথক মর্যাদা দিয়েছেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি এবং মাওলানা হিফযুর রহমানদের মতো বিজ্ঞ আলেমগণ পুঁজিবাদের মারাত্মক কুফল থেকে বাঁচার পথ হিসাবে রাষ্ট্রীয় মালীকানার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এ যুগে মাওলানা মওদূদীর পূর্বে এ বিষয়টি এমন সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদকে আর কেউ সুস্পষ্টভাবে পেশ করেননি। মাওলানার চিন্তারধারার সূত্র ধরে গত অর্ধ শতাব্দিতে গোটা বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাবিদদের এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠেছে।

আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের পক্ষে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের উদ্ভাবিত মতবাদসমূহকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ওলামায়ে কেরামের পক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে ঐ সব মতবাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিল না। "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" নামক বইটিতে মাওলানা মওদূদী ঐ সব মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করতে যেয়ে যে সূক্ষ্ম যুক্তি পেশ করেছেন তা আধুনিক শিক্ষিত মনে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। উচ্চ শিক্ষিতদের চিন্তা শক্তিকে জড়বাদ, দ্বন্দ্ববাদ, জাতীয়তাবাদ ও জনগণের সার্বভৌমত্ব যেভাবে আচ্ছন্ন করে আছে এবং এসব মতবাদের ভিত্তিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম বিরোধী চিন্তা, চেতনা ও অভ্যাস যে পরিমাণে আসন গেড়ে বসেছে

তা থেকে শুধু তারা উপকার পাচ্ছে যারা মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় পাশ্চাত্যের যে সব মনীষীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করছিলাম তাদের মতবাদকে বলিষ্ঠ সূক্ষ্ম যুক্তির মযবুত ডাণ্ডা দিয়ে মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে খণ্ডন করেছেন। আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় বড় মনীষীদেরকে এভাবে নাজেহাল হতে দেখে প্রথমে অন্তরে অস্বস্তিবোধ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মন প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। অথচ এক সময় ঐ সব মতবাদকে সঠিক বলেই মনে করেছিলাম। এভাবেই মাওলানার সূক্ষ্মদর্শিতা উচ্চ শিক্ষিত মুসলিমদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আস্থা বহাল করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

সর্বশেষে একজন সংগঠক হিসাবে তিনি যে অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তব সত্য। তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠনকে নিখুঁত ও মযবুত করে গড়ে তুলবার জন্য যেসব হেদায়াত দিয়েছেন তা তাঁর গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার বাস্তব সাক্ষী। জামায়াতের গঠনতন্ত্র, কার্যবিবরণীর প্রতিটি খণ্ড এবং বেশ কয়টি বইতে সংগঠন সম্পর্কে খুঁটিনাটি পয়েন্টও বাদ দেননি। তাঁর এসব হেদায়াত মেনে চললে কখনও সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দেবার কারণ ঘটতে পারে না।

মাওলানার জীবনের শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য

মাওলানা মওদূদীর (রঃ) চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও সাংগঠনিক শৃংখলার ছাপ তাঁর বাস্তব জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তাঁর সবকিছুতেই পারিপাট্য ছিল, যে ঘরে তিনি লেখাপড়া করতেন সে ঘরে বসেই আমীরে জামায়াত হিসাবে কাগজপত্র দেখা, চিঠির জওয়াব লেখা ও ফাইলপত্রে নোট দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। এ সত্ত্বেও তাঁর টেবিল কোন সময়ই অগোছালো পাইনি। কলম, পেন্সিল, পেপার ওয়েট, কলমদান ইত্যাদি সবসময় সুশৃংখলভাবে সাজানো দেখেছি।

এ বৈঠকখানায়ই মাজলিশে আমেলার বৈঠকে বহুবার বসেছি। ঘরটি তেমন বড়ও নয়। বই এর আলমারীগুলো তিনদিকে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে বিরাট টেবিল। আমেলার সদস্যগণ টেবিলের তিনদিকের চেয়ারে বসলে শুধু একদিকে আর এক সারি চেয়ার দেবার জায়গা থাকে। আমেলার বৈঠক বসলে ঘরে আর খালি জায়গা থাকে না। এ অবস্থায়ও ঘরে কোথাও এদিক ওদিকে এলোমেলোভাবে কোন বই পড়ে থাকতে দেখিনি।

আমি শত চেষ্টা করেও আমার টেবিল ও পড়ার ঘরটিকে এমন পরিপাটি করে রাখতে পারি না।

নিয়মিত পান খাওয়া সত্ত্বেও দাঁত সবসময় পরিষ্কার দেখেছি। পোশাক পরিচ্ছদে মোটেই বিলাসী ছিলেন না। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। ঢাকায় তাঁর সফরকালে দেখেছি যে বাইর থেকে এসে শেরওয়ানী খুলবার সময় আমি বা আর কেউ তাঁর হাত থেকে শেরওয়ানীটা নিয়ে হেংগারে ঝুলিয়ে রাখার পর যদি সামান্য বাঁকা অবস্থায়ও দেখতেন তাহলে উঠে সোজা করে রাখতেন, বাঁকা অবস্থায় থাকতে দিতেন না। তাঁর সামান্য খেদমত করতে গেলে এসব দিকে খেয়াল রাখতে হতো। সফরে কোথাও যাবার সময় ট্রেন বা ষ্টীমারে তাঁর সুটকেসটা সুন্দর করে রাখা না হলে নিজে উঠে সোজা ও পরিপাটি করে রাখতেন।

এ মানুষটিকে আল্লাহ যেমন দৈহিকভাবে সুন্দর করে তৈরী করেছেন তেমন তাঁর উঠা, বসা, চলাফেরা, খাওয়া ও শোয়া সবই সুন্দর। পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য তাঁর ফিতরাতই ছিল। কোথাও বসলে সেগুলেটি পর্যন্ত এলোমেলো করে রাখতেন না। ছোটখাট বিষয়েও তিনি নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতেন। পত্রিকা পড়ে রেখে দেবার সময় সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখতেন। এলোমেলো অবস্থায় ফেলে রাখতেন না।

জেলে তো নিজেকেই সবকিছু করতে হয়। লাহোর জেলে থাকাকালে তাঁর কামরায় যেয়ে কিছু খেদমত করার চেষ্টা করেও সুযোগ পাইনি। আলনায় কাপড় গুছানোই পেয়েছি। টেবিলে বইপত্র সাজানো, তোয়ালে সুন্দর করে ঝুলানো, দাঁতের ব্রাশ ও পেষ্ট যথাস্থানে রাখা এবং সবকিছু ঠিক যেমনভাবে থাকা সুন্দর মনে করেছি সেভাবেই পেয়েছি। তাই কোন দিনই সেখানে সামান্য একটু কাজ করার সুযোগও পেলাম না।

মাওলানার মেজায

আল্লাহ তায়ালা মাওলানা মওদূদীকে যত বড় ও মহত গুণাবলী দিয়ে সজ্জিত করেছেন তাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর প্রশান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ মেজায। আবেগ তাড়িত হলে কোন কোন সময় স্নায়ুর দুর্বলতা সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু মাওলানা এ ব্যাপারে বিরল ব্যতিক্রম। তাঁকে কোন সময় আমি রাগ প্রকাশ করতে দেখিনি। কোন সময় রাগ করার কারণ ঘটলে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠতে দেখেছি। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও এমন কোন আচরণ দেখিনি যা অন্য দশজনের মধ্যে দেখা যায় এবং যা রাগের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে গণ্য করা যায়।

অসন্তুষ্ট অবস্থায় তাঁর আচরণের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৫৬ সালে এ দেশে তাঁর প্রথম সফরে নীলফামারী জিলার সৈয়দপুরে জনসভার প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু কাল বৈশাখীর মতো ঝড়বৃষ্টির দরুন জনসভাটি হতে পারেনি। পরের দিন প্রোগাম ছিল পার্বতীপুরে। সৈয়দপুরের জনগণ দাবী জানান যে বিকালে জনসভার সময় দিতে না পারলে অন্ততঃ সকালে রেলষ্টেশনে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে মাওলানাকে এক নযর দেখার ও তাঁর মুখ থেকে দুটো কথা শুনার সুযোগ দিতে হবে।

মাওলানা অনির্ধারিত অতিরিক্ত একটি প্রোগ্রাম নিতে আপত্তি করলেন। শেষ পর্যন্ত জামায়াতের সৈয়দপুর শাখার নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের চাপে মাওলানা রাযী হলেন। রেলগাড়ী সৈয়দপুর ষ্টেশনে ঢুকবার সাথে সাথে বিরাট প্লাটফর্ম ভর্তি জনতার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর শ্লোগানে ষ্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল। মাওলানা গাড়ীর দরজার সামনে হাযীর হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে এলেন, আমি তাঁর উর্দু কথার অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ থেকে দেয়া শ্লোগানের প্রতিক্রিয়া কী তা দেখার জন্য তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে বললেন "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের বদলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলতে বলুন।" মাওলানার ঠোঁটে স্বাভাবিক মুচকী হাসি না থাকায় বুঝলাম যে জোর করে আনায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আগের রাতে ঘুম কম হওয়ায় এবং সকালেই গাড়ীতে রওনা হওয়ার ফলে তিনি অবশ্যই ক্লান্তি বোধ করছিলেন।

পার্বতীপুর থেকে রওনা হবার সময় ষ্টেশনে কয়েকজন মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? জওয়াবে বললেন, "আমি যাচ্ছি না, আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"এখানেও অসন্তুষ্টির প্রকাশ এটুকু হলো।

মাওলানার এত বড় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মেজাযে কখনও সামান্য বড়ত্ব প্রকাশ পেতে দেখিনি। হামবড়া ভাব তাঁদের আচরণেই দেখা যায় যারা সত্যিকার বড় না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। মাওলানা একেবারেই নিরহংকার ছিলেন। আচরণে স্পষ্ট সরলতা তাঁর স্থায়ী অভ্যাস ছিল। আত্মসম্মানের কোন ভনিতা তাঁর মধ্যে ছিল না, তাঁর অফিসে জামায়াতের পিয়নও আমাদের মতোই ব্যবহার পেত। পিয়ন ঘরে ঢুকে শুধু মাওলানা শব্দে সম্বোধন করে বিনা সংকোচে কথা বলত। কোন চিঠি বা নোট তাঁর হাতে দিয়ে জওয়াবের অপেক্ষায় মাওলানার সামনেই চেয়ারে বসে যেত। পয়লা যখন এভাবে পিয়নকে দেখেছিলাম তখন বিস্মিত হয়েছিলাম। এটাই যে ইসলামী আচরণ তা অনুভব করে তৃপ্তি বোধ করলাম।

মাওলানার আড়ম্বরহীন মেজাযের কারণে তিনি সবসময় সবার সাথে হালকা আলোচনায় শরীক হতে পারতেন। কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে নিজকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখতেন না। উঠা বসা, চলা ফেরা, বৈঠক কথাবার্তা ও খাওয়ার সময় তিনি যেসব হালকা রসিকতা করতেন তা উপস্থিত সবাইকে নির্মল আনন্দ দান করত এবং মাওলানাকে অতি আপন জন মনে করতে সাহায্য করত।

হালকা রসিকতার নমুনা

মাওলানার ঘনিষ্ট সাথী এবং মাওলানার সম্পাদনায় প্রকাশিত ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক মুখপত্র মাসিক তরজুমানুল কুরআনের বর্তমান সম্পাদক প্রখ্যাত কবি নাঈম সিদ্দীকী মাওলানার রসিকতা সম্পর্কে কাব্যিক ভাষায় নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

"মাজলিসের আকাশে কথাবার্তার শেষের ফাঁকে ফাঁকে মাওলানার রসিকতা বিদ্যুতের মতো চমকাতে থাকে। তিনি অন্যের কাছ থেকে ধার করা পুরানো রসিকতা করেন না। তাঁর রসিকতার সবটুকুই রেডিমেড তাজা ও পরিবেশের উপযোগী।" নাঈম সাহেবের এ চমৎকার মন্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। কয়েকটি নমুনা এর সাক্ষ্য বহন করে।

পাঞ্জাবে সড়কপথে কয়েকটি মোটর গাড়ীতে সফর হচ্ছিল। পেশাব, পায়খানার জন্য পথে এক জায়গায় গাছের নীচে গাড়ী থামল। আশেপাশে কোথাও পানির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরলেন তাদেরকে মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাই ! পানি পেয়েছিলেন ? সবাই জানালেন যে দূর দূর পর্যন্তও পানি নেই। মাওলানা বললেন, "তাহলে আপনারা ড্রাই ওয়াস করেছেন নিশ্চয়ই ?"

উর্দু ভাষায় শব্দ প্রয়োগে এমন কি ক্রিয়াপদেও পুংলিংগ ও স্ত্রী লিংগ ব্যবহার করতে হয়। তখনও উর্দু বলা আমি রপ্ত করতে না পারায় আমি উর্দু ভাষায় লিংগ জ্ঞানের অভাবে ভুল করতাম। মাওলানার সাথে একবার অন্য একজনে আমার ভুল ধরে বসল। আমি মাওলানাকে বললাম, "এটা এক মুসিবত দেখছি। এ শব্দটি কী কারণে পুংলিংগ আর ঐ শব্দটি কেমন করে স্ত্রী লিংগ হলো তা বুঝব কেমন করে ?" মুচকী হেসে মাওলানা বললেন, "আপনাকে এত লোকের সামনে এসব শব্দের লিংগ দেখাব কী করে ?"

নাস্তার শেষে সবাইকে চা পরিবেশন করা হচ্ছিল। আমার সামনেও এক কাপ এলো। আমি বললাম, আমি চা খাই না এটা নিয়ে যান। মাওলানা

বললেন, "এ দুধের বাচ্চাটিকে দুধ দিন। শিশিতে দিতে হবে না, কাপে দিলেও চলবে।"

বাড়ী থেকে নাস্তা সেরে মাওলানার থাকার জায়গায় গিয়ে দেখি যে, মাওলানা নাস্তার পরে চা খাচ্ছেন। বেশ কয়জন সাথে নাস্তা করেছেন। একজন বললেন, একটু আগে আসলে কলা পেতেন। কলার বেশ কিছু স্তুপ হয়েছিল। সেদিকে ইশারা করে মাওলানা আমাকে বললেন, "আসুন কলা খান।" বললাম "আমার জন্য তো রাখেননি।" তিনি বললেন, "এই যে রয়েছে।" "বাইরের খোলসটুকুই শুধু রেখেছেন।" তিনি বললেন, "আমরা বাইরের পোশাক টুকু দেখেই তো চিনতে পারি যে আযম সাহেব এসেছেন। ভেতরটা কি খুলে দেখি ?"

এক সফরে মাওলানা খুলনা সার্কিট হাউজে ছিলেন। সকালে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ঘুম হলো ? বললেন, "সারা রাতই মিছিল ও শ্লোগান শুনলাম।" বিস্মিত হয়ে তাকালাম। মৃদু হেসে বললেন, মশকবাহিনীর মিছিল মশারীর চারপাশে তাওয়াফ করতে থাকল। ভেতর থেকে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।" জানতে চাইলাম কী শ্লোগান দিচ্ছিল ? বললেন, "কাপুরুষের মতো লুকিয়ে আছ কেন ? সাহস থাকলে বেরিয়ে আস।"

১৯৫৬ সালের সফরে ঠাকুরগাঁয়ে আমরা অনেকেই মাওলানার সাথে যাচ্ছিলাম। ঐ এলাকায় নাকি সবাই সালুনের সাথেই ডাল মিলিয়ে খায়। মাওলানা সালুন দিয়ে খাচ্ছিলেন। তাঁকে ডাল দিতে গেলে তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আমি যুক্ত নির্বাচন পছন্দ করি না।" ঐ সফরে তিনি জনসভায় জামায়াতের দাওয়াত পেশ করার শেষে রাজনৈতিক পয়েন্টে আলোচনার সময় যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করতেন।

এক বৈঠকী আলোচনায় দিনাজপুরে এক অবাংগালী ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিসের ব্যবসা করেন ? ঐ লোক বললেন "চামড়ার ব্যবসা।" মাওলানা বললেন, "মুরগীর চামড়া নয় তো?" বেচারা হকচকিয়ে চেয়ে রইলেন। মাওলানা বললেন, এ সফরে সব জায়গায়ই এত মুরগী খেলাম যে, আমার ধারণা হলো যে গরু খাশী বোধ হয় খাওয়া হয় না।

১৯৫৬ সালে মাওলানা সর্বপ্রথম এদেশে সফরে আসেন। ইতিপূর্বে তিনি ডাব দেখেননি। নারিকেল খেলেও ডাব খাবার সুযোগ পাননি। ডাব দেখে তিনি বললেন, "এত বড় বড় বোমা দিয়ে কী করবেন ?" বলা হলো যে এর মধ্যে মজাদার পানি আছে। বললেন "পানি বের করান দেখি।" এক পাশ দিয়ে ডাবের পানি শো করে ছিটকে বের হতে দেখে বললেন ঃ "এত

হার্ডপ্রেস করে রাখা হয়েছে ?" ডাবের পানি খেয়ে বললেন, "এমন চমৎকার শরবত কোন সময় খাইনি। পানি ঢেলে নেবার পর যখন ডাবটা দুটুকরা করা হলো তখন জানতে চাইলেন যে এর ভেতর আরো কিছু আছে নাকি ? ভেতরের হালকা ও নরম নারিকেল তস্তরীতে করে খেতে দেয়া হলো। খেতে খেতে বললেন, "এমন মজাদার মালাই কখনও খাইনি।" এমনিভাবে কলা সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, "এ যে একেবারে রেডীমেড হালুয়া।" কী নিপুণভাবে প্যাকেটবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঐ বছরই উত্তর বংগ সফরে ব্রড গেজের বড় রেলগাড়ীতে সফরের সময় সান্তাহার জংশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থেমে ছিল। মাওলানার ফার্ষ্ট ক্লাশ বগীতে উঠেই দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে অন্ধকার হয়ে গেল। ভেতরের বাতি নিভিয়ে রাখা ছিল। আমি তা বুঝতে পারিনি। অন্ধকার দেখে বললাম, "বাতি নিভে গেল নাকি ?" মাওলানা বললেন "দরজাটা খুলুন।" খুলবার সাথে সাথে বাতি জ্বলে উঠল। মাওলানা মুচকি হেসে বললেন, "কেরামতী দেখলেন তো ?" দরজা বন্ধ ও খোলার সাথে আলো জ্বলা ও নিভে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার আগে জানা না থাকায় আমার চেহারায় বিস্ময়ভাব দেখে তিনি কেরামতীর রসিকতা করলেন।

মাওলানা খুব ঠাণ্ডা পানি পছন্দ করতেন। একবার শীতকালে ঢাকায় সফর করছিলেন। পানি তেমন বেশী ঠাণ্ডা না থাকায় বললেন, "শীত কালেও ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারলেন না ? আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন ?"

মাওলানার খাদ্যাভ্যাস

মাওলানা মওদূদীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের দীর্ঘ বিশ বছরে এক সাথে খাওয়া ও নাস্তা করার অগণিত সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দীর্ঘ সফরের সময় এবং আরও ঘনিষ্টভাবে দুমাস লাহোর জেলে থাকা কালে তাঁর খাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে।

তিনি পরিমাণে এত কম খেতেন যে আমি ভাবতাম যে, এত অল্প খেলে স্বাস্থ্য কিভাবে ঠিক থাকবে। পরে বুঝতে পারলাম যে খাওয়ার পরিমাণটা প্রধানতঃ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। রাসূল (সাঃ) পেটের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণত পেট ভরে খাওয়ার অভ্যাসই সবাই করে। এটা দেহের দাবীর চেয়ে মনের চাহিদার কারণেই হয়ে থাকে।

তিনি ধীরে সুস্থে খেতেন। তাড়াহুড়া করে খেতে দেখিনি। ভাত বা পোলাও কমই পছন্দ করতেন। রুটিই তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল। ভাত খেতে হলে চামচ

দিয়ে খাবার তুলে নিতেন। তিন আংগুলে রুটির টুকরা ধরে সালুন লাগিয়ে এমনভাবে মুখে দিতেন যে হাতে সালুন কমই লাগতো

তিনি গোশত ও সবজী বেশী পছন্দ করতেন। মাছ খুব কমই পছন্দ করতেন। ছোট ছোট কাঁটা নেই বলে নিশ্চয়তা পেলে মাছ খেতেন, আমাদের ভাতের সাথে মাছ মিশিয়ে খেতে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "ভাতের মধ্যে কাঁটা লুকিয়ে গেলে কেমন অবস্থা হবে?" বুঝলাম এটাও অভ্যাসের ব্যাপার। আমরা এতে অভ্যস্ত বলে সামান্য অসুবিধাও বোধ করি না, যদিও মাঝে মাঝে গলায় কাটা বিধে যায়।

মাওলানার দাঁতের অবস্থা ভাল ছিল না বলে শক্ত জিনিস চিবাতে পারতেন না। আমাদেরকে মুরগীর হাড় মড় মড় করে চিবাতে দেখে তিনি বললেন, এককালে আমিও তা পারতাম। কিন্তু এখন মুরগী আমার দাঁত থেকে আযাদী হাসেল করেছে।

মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাওলানা সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ৪০ দিন সফর করেন। প্রধানত ঐ সময়কার ১৭টি জিলা শহরে এবং কয়েকটি মহাকুমা শহরে তিনি জনসভা ও সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। এ ছাড়া রুকন ও কর্মী সম্মেলন এবং ছাত্র সমাবেশেও যোগদান করেন।

১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে তিনি সর্বশেষ সফর করেন। ৬৯ সালেও কয়েক সপ্তাহ বিভিন্ন জিলায় গিয়েছেন। ৫৬ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৬/৭ বার এ দেশে এসেছেন—সঠিক সংখ্যা মনে নেই।

মাওলানার সফর সংগীদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রহীম ও আমি সব জায়গায়ই ছিলাম। অনুবাদের দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হতো। রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীরগণও নিজ নিজ বিভাগের জিলাসমূহে সফর সংগী ছিলেন।

১৯৫৬ সালের প্রথম সফরে তিনি প্রধানত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতই দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে আদর্শ প্রস্তাব ও কতক ইসলামী ধারা থাকায় গণপরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ এতে দস্তখত না করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন না থাকার অজুহাতে এর বিরোধিতা করায় মাওলানা তাঁর দাওয়াতী বক্তৃতার শেষে শাসনতন্ত্রের পক্ষে এটুকু কথা বলতেন যে "৪৭ সাল থেকে ৯ বছর

বিনা শাসনতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলে এসেছে। বর্তমান অবস্থায় এ শাসনতন্ত্র মেনে নিয়ে পরবর্তীতে একে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।"

ঐ বছরই আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সোহরাওয়াদী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়ে পূর্ব প্যাকিস্তানে সফরে এসেই পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে। বাকী ২ ভাগের ব্যবস্থা পরে হবে। তখন শাসনতন্ত্রে নির্বাচন পদ্ধতি অমীমাংসিত থাকায় জনাব সোহরাওয়ারদী পৃথক নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে যুক্ত করার চেষ্টা চালান।

মাওলানা মওদূদী তাঁর ঐ সফরে যুক্ত নির্বাচনের কুফলও তুলে ধরেন। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার কারণেই মুসলমানদের ভোটে ভারত বিভক্ত হয়ে প্যাকিস্তানের জন্ম সম্ভব হয়েছে বলে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, যুক্ত নির্বাচন চালু হলে নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তান ভেংগে যাবার আশংকা রয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন মাওলানার ঐ কথাই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

সুধী সমাবেশে মাওলানা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুক্তি দ্বারা ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করতেন এবং এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ দূর করতেন। আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হতো তার এমন চমৎকার জওয়াব দিতেন যে সুধীবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তা শুনতেন।

৫৬ সালের ঐ পয়লা সফরের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সুধী সম্মেলনে তিনি "পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও এর সমাধান" শিরোনামে যে মহামূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রশংসিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশেম বক্তৃতা মঞ্চে আমার পাশে বসেই ঐ বক্তৃতা শুনছিলেন। তিনি আমার কানে কানে মন্তব্য করলেন, "মাওলানা মওদূদীর কয়েকটি বই পড়ে তার বক্তৃতা শোনার আগ্রহ হলো। শুধু মাদ্রাসার ডিগ্রীধারী কোন আলেম হলে আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত লোকদের উপযোগী করে এমন চমৎকার বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হতো না। আমার আশা সার্থক হয়েছে।"

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে ঐ বক্তৃতায়ই বলেছেন যে, ইংরেজ আমল থেকেই এ বৈষম্য উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। ইংরেজরা পাঞ্জাব থেকে সেনাবাহিনীতে সবচেয়ে বেশী লোক নিয়েছে। বাংগালীদেরকে তারা নেয়নি বললেই চলে। তিনি জনসভায় ও

সূধী সমাবেশে এ বিষয় বলেছেন, "আমি কর্তৃপক্ষ থেকে একথা জেনে বিস্মিত হয়েছি যে, দৈহিক উচ্চতার মান অনুযায়ী বাংগালী কম পাওয়া যায়। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে চীন ও জাপানের লোক বাংগালীদের চেয়েও খাট। তাহলে তাদেরকে কি পাঞ্জাবী ও পাঠানদেরকে নিয়ে তাদের সেনাবাহিনী গড়তে হবে ? এ ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভর্তি করতে হবে।"

সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে তিনি এ যুক্তিই প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ফলে মধ্যভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার লোকেরাই বেশী সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর গোটা ভারতের মুসলমান অফিসাররাই পাকিস্তানের শাসনভার হাতে পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী সরকারী কর্মচারীও জনগণের ভাই হিসাবে তারা যদি আচরণ করতো তাহলে পরিবেশ ভিন্ন হতো। তারা ইংরেজদের গদীনশীল হয়ে এমন আচরণ করেছে যা মানসিক বৈষম্যও সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যা কমই ছিল। কিন্তু তারা বাংলাভাষী ছিল না বলে তাদেরকে পাঞ্জাবী মনে করা হয়।

তিনি ঐ অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আপনারা বাংলাভাষা শিখুন। বাংগালী কর্মচারীদের প্রশাসনিক যোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করান এবং বাংগালীদেরকে বেশী সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে ভর্তি করে এ অভাব পূরণ করুন। তাহলে ক্রমে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হতে থাকবে।

তিনি ভারত থেকে হিজরত করে আসা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এদেশের গোটা অর্থনীতি অমুসলিমদের হাতে ছিল বলে আপনাদের আগমনে মুসলিম জাতি খুবই আনন্দিত। কিন্তু আপনাদের আচরণে স্থানীয় লোকেরা খুশী নয়। স্থানীয় লোকদেরকে ব্যাপকভাবে আপনারা কাজে নিয়োগ করুন এবং তাদের ভাষায় কথা বলুন। তাদেরকে ব্যবসা ও শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিন। তাহলে তারা আপনাদেরকে আপন মনে করবে।

"এদেশটি কেমন লাগছে"—আমার এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, "মনে হয় গোটা দেশটাই এক সাজানো বাগান। এমন সবুজের সমাহার পশ্চিম পাকিস্তানে আযাদ কাশ্মীর ছাড়া কোথাও দিখিনি। ওখানে মাইলের পর মাইল মাটি, পাথর আর বালিই চোখে পড়ে। এখানে তো খালি মাটি দেখাই যায় না।"

ঢাকা থেকে বরিশাল ও খুলনায় ষ্টীমারে যাওয়ার সময় তিনি ঘুমাবার সময়টুকু ছাড়া কেবিনে থাকতে চাইতেন না। কেবিনের বাইরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে থাকতেন। কোন বই পড়তে দেব কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "বই পড়ার সময় বহু আছে। এমন চোখ জুড়ানো দৃশ্য কোথায় পাবো?"

গাছের মধ্যে তিনি নারিকেল ও সুপারী গাছের খুব প্রসংশা করলেন। নদীর তীরে এবং গ্রামগুলোতে সবগাছ ছাড়িয়ে নারিকেল ও সুপারী গাছ বেশী সংখ্যায় চোখে পড়ছে। সুপারী গাছ কখনও আগে দেখেননি। জিজ্ঞেস করলেন, "এত দীর্ঘ খুঁটির মাথায় ফুলের গুচ্ছের মতো সাজানো পাতা দেখা যাচ্ছে। এগুলো কী গাছ?" নারিকেল পাতার গভীর সবুজ রং দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোনটাকে বেশী ভালবাসেন?" পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার চোখ দুটোর কোনটা বেশী পছন্দ করেন?" পাল্টা প্রশ্ন করে জওয়াব দেবার যোগ্যতার আর এক প্রমাণ তিনি দিলেন যখন জানতে চাইলাম, "পুঁজিবাদ ও সমাজ তন্ত্রের মধ্যে কোনটা বেশী মন্দ?" বললেন, "কলেরা ও বসন্তের মধ্যে কোনটা বেশী খারাপ?"

দু'জনের সাথে মাওলানার উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার

আমার মাধ্যমে মাওলানার সাথে দুজন বিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হয়। এ দুটো সাক্ষাৎ একান্তে হয়। বৈঠকী আলোচনা উপলক্ষে অনেকেই মাওলানার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এবং ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু ঐ দুটো সাক্ষাৎকার ভিন্ন ধরনের ছিল।

তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা আমার শ্রদ্ধেয় কাসেম ভাই (ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম) মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি ত্বরিৎ ব্যবস্থা করলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে কাসেম ভাই কুরআনের দুটো আয়াত উদ্ধৃতি করে যুক্তি পেশ করলেন যে, ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না এবং শ্রম ব্যতীত উৎপাদনে কোন অধিকার দান করে না। আয়াত দুটো হলো, "লিল্লাহি মা ফীসসামাওয়াতি ওমা বিল আরদ" এবং "লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা-আ।"

মাওলানা বললেন, "কুরআনের কোন আয়াতের এমন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয় যা অন্য আয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী হয়। আল্লাহ

স্বয়ং মানুষকে সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে দান করলে তা কর্যে হাসানা হিসাবে গ্রহণ করেন বলে ঘোষণা করেছেন। সম্পত্তির মালিকানা আছে বলেই এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসাবে অন্য লোকেরা ঐ সম্পদের মালিক হয়। কুরআন ঐ সম্পত্তিতে কার কত হিস্যা তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই যে অর্থ আপনি করেছেন তা কুরআনের অন্য বহু আয়াতের সাথেই সাংঘর্ষিক।

ঐ আয়াতের অর্থ হলো এই যে, গোটা বিশ্বে আল্লাহর ক্ষমতাই নিরংকুশ এবং সবকিছুই তাঁর হাতে রয়েছে। আসমান ও যমীনের এমন আর কোন শক্তি নেই যে আল্লাহর ইখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং চূড়ান্ত ও স্থায়ী মালিক। তিনি যাকে যতটুকু মালিকানা স্বত্ব দান করেন এর বেশী অধিকার কারো নেই।"

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আন নাজমের ৩৯ আয়াত। এ সম্পর্কে মাওলানা বললেন, "এ আয়াতের পূর্বে ও পরে কয়েকটি আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে ওখানে আখিরাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ওখানে প্রসংগই হলো আখিরাত। এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে একজনের পাপের বোঝা আর একজনকে বইতে হবে না। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে যতটুকু চেষ্টা-সাধনা করেছে শুধু তাই আখিরাতে পাবে। চেষ্টা না করে থাকলে পাবে না।

যদি এ আয়াত থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যা আপনি বলছেন, তাহলে অকর্মণ্য, বৃদ্ধ, পংগু ও শিশু উৎপাদনে শ্রম দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব জমি ও কারখানার উৎপাদনে কোন হিস্যাই পাবে না। আল্লাহ পাক উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে এসব অক্ষম লোকদেরকে বঞ্চিত করেননি। শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র ফেক্টর নয়। এ মতবাদ কার্ল মার্কস-এর। ইসলাম এ মতবাদ সমর্থন করে না।"

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি আমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) মাওলানা মওদূদীকে মহব্বত করতেন। কিন্তু মাওলানার "খেলাফত ও মুলূকিয়াত" বইতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে যেসব অভিযোগ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি সহকারে পেশ করেছেন সে বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন এবং কোন কোন ঐতিহাসিককে শিয়া বলে ধারণা করতেন। এভাবে তিনি মাওলানা মওদূদীর ঐতিহাসিক উৎস সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। আমি তাঁকে বললাম, "মাওলানা মওদূদী আগামী সফরে ঢাকা এলে আপনার সাথে তাঁর এ বিষয়ে সাক্ষাৎ আলোচনার ব্যবস্থা

করতে চাই। তিনি রাযী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যখন মাওলানা ঢাকায় এলেন তখন মাওলানা ফরিদপুরী সম্পূর্ণ শয্যাগত। লালবাগ মাদ্রাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন কথা বলতেও অক্ষম। খুব কাছে বসে তাঁর সাথে হাত মিলায়ে বললাম যে, পূর্বের কথামতো আপনাকে মাওলানা মওদূদীর কাছে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। আপনার অসুস্থতার কারণে নিজে যেতে না পারলেও আপনার প্রতিনিধি হিসাবে যাকে মনোনীত করেন তাঁকেই নিয়ে যাব। তিনি আংগুলের ইশারায় তাঁর ঠোঁটের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে বললেন। ফিসফিস করে মাদ্রাসার প্রখ্যাত সিনিয়ার মুহাদ্দিস সাহেবকে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁকে সাথে নিয়ে মাওলানার সামনে হাযীর করলাম।

পূর্বেই সব কথা জানা থাকায় মাওলানা মওদূদী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে কাছেই বসালেন। প্রাথমিক পরিচয় মূলক দু এক কথার পরই মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, "আমার লেখা সম্পর্কে আপনার কোন বিষয়ে আপত্তি মেহেরবানী করে বলুন।" মুহাদ্দিস সাহেব বললেন "আপনার খেলাফত ও মুলূকিয়াত বইতে হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) বিরুদ্ধে কতক অভিযোগ এনেছেন। একজন সাহাবীর দোষ চর্চা করা কি জায়েয হয়েছে ?" মাওলানা বললেন, "কোন অভিযোগটি সম্পর্কে আপনার আপত্তি ?" মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, "আপনি লিখেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হুজর বিন আদী (রাঃ)-কে হত্যা করেছেন। একজন সাহাবী আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে যালেম হতে পারেন না।"

মাওলানা বললেন, "যাকে কতল করা হয়েছে তিনিও তো সাহাবী। তাহলে আমার ও আপনার অপরাধ একই সমান। কারণ যে সাহাবীকে কতল করা হয়েছে তাকে যদি ন্যায়ভাবে কতল করা হয়ে থাকে তাহলে তিনি দোষীই সাব্যস্ত হন। এ অবস্থায় আমি এক সাহাবীকে দোষী বলেছি, আর আপনি অন্য এক সাহাবীকে দোষী মনে করছেন। তবে পার্থক্য এই যে, আমি মযলুমের পক্ষে, আর আপনি যুলুমের পক্ষে।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে, মাওলানা কত সাবধানে মন্তব্য করলেন। একদিকে মযলুম বলার পর অপর দিকে 'যালিম' শব্দ ব্যবহার না করে 'যুলুম' বললেন।

এটুকু আলোচনার পর উভয় পক্ষ চুপ করলেন। মুহাদ্দিস সাহেব আর কোন আপত্তি উত্থাপন করলেন না। মাওলানাও আর কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন না। এ অবস্থায় মুহাদ্দিস সাহেবকে নিয়ে মাওলানার

নিকট থেকে বিদায় হলাম এবং তাঁকে লালবাগ মাদ্রাসায় পৌঁছিয়ে দিলাম। পথেও আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি।

মাওলানার লেখা সাহিত্য অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা

১৯৫৩ সালে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে মাওলানার "একমাত্র ধর্ম" বইটি পয়লা পড়ার সুযোগ পাই। বইটি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ছিল। বইটি ক্ষুদ্রাকার হলেও চিন্তার বিরাট খোরাক এতে রয়েছে। দ্বীনে হক নামক উর্দূ বইটির অনুবাদই "একমাত্র ধর্ম।" অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সর্বকালের জন্য এবং সকল দেশের মানুষের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান রচনা করা মানুষের পক্ষে বাস্তবে সম্ভবই নয়। তাই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। মাওলানার ঐ মযবুত যুক্তিমালা খণ্ডন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এর পরপরই ইংরেজীতে "পলিটিকেল থিওরী অব ইসলাম" বইটি পেলাম তমদ্দুন মজলিসেরই মাধ্যমে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকায় এ বইটি আমার মনের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের রাজনৈতিক বিধান সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমার স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না। ইতিপূর্বে অন্য লেখকদের কিছু বই পড়ে যে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এ বিষয়ে জ্ঞানের তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। মাওলানার এ চটি বইটিতে বিস্তারিত জ্ঞান না পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে এমন বুনিয়াদী ধারণা পাওয়া গেল যাতে আমি সুস্পষ্ট ইংগিত পেয়ে গেলাম। ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তুলবার পথ পেয়ে গেছি বলে পরম উৎসাহ বোধ করলাম। পরবর্তী কালে জামায়াতে যোগদান করার পর যখন বিপুল ইসলামী সাহিত্যের নাগাল পেলাম তখন মাওলানার বিরাট ও বিখ্যাত "ইসলামিক ল এণ্ড কনসটিটিউশান" অধ্যয়ন করে ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেলাম।

আধুনিক যুগে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে যেসব বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তাঁর নিকট পেশ করে চমৎকার মীমাংসা পেয়েছি। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণকে অংশ গ্রহণের সুযোগদান এবং সত্যিকার গণ প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী স্বার্থকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করা যে সত্যিই সম্ভব তা মাওলানার সাহিত্য প্রমাণ করেছে।

তমদ্দুন মজলিসে থাকাকালে মাওলানার এ দুটো বই পড়ে মাওলানা মওদূদীকে একজন বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করলেও তাঁর পরিচালনায় কোন ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন চলছে বলে আমার ধারণা জন্মেনি। ১৯৫৩ সালে মাওলনাকে ফাঁসি দেবার ঘোষণাটিও তমদ্দুন মজলিস নেতৃবৃন্দের মাধ্যমেই পয়লা জানতে পেরেছি। তখনও জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারিনি।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর মাওলানার সাহিত্য ভাণ্ডার ও সাংগঠনিক পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। মাওলানার লেখা তাফসীর ও অন্যান্য সাহিত্য বাংলায় তখনও অনূদিত না হওয়ায় ইসলামের জ্ঞান পিপাসা আমাকে উর্দু শিখতে বাধ্য করে। মাওলানা রচিত সাহিত্যের ভাষা আমাকে এতটা মুগ্ধ করেছে যে তাঁর কোন বই-এর অনুবাদ পড়ে আমি মোটেই তৃপ্তি পাই না বলে আমি তাঁর যাবতীয় বই মূল উর্দূ ভাষায়ই পড়ি এবং অপরকেও উর্দু শিখতে উৎসাহ দেই।

মাওলানার পেছনে নামায আদায়

মাওলানার ইমামতীতে নামায আদায় করার অগণিত সুযোগ পেয়েছি। লাহোর জেলে দু মাস, মাজলিসে শূরা ও আমেলার বৈঠক উপলক্ষে এবং সফর সাথী হিসাবে মাওলানার পেছনে যতবারই নামায আদায় করেছি প্রতিবারই রুহানী তৃপ্তি বোধ করেছি। বিশেষ করে নামাযে তাঁর কেরাত শুনতে যে কী মজা পেতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কেরাআতে ক্বারী সুলভ সামান্য কৃত্রিমতাও ছিল না। তিনি সহজ সরলভাবে কেরাআত পড়তেন। তাজবীদেও ত্রুটি ছিল না। তাঁর আওয়াজে চমৎকার আকর্ষণ বোধ করতাম। মনে হতো যেন কেরাআত পড়ার সময় আয়াতের মর্মকথা তাঁর উচ্চারণের সাথে প্রকাশ পেতো।

১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী লাহোরে ফজরের দু' ঘণ্টা আগে পুলিশ ঘুম থেকে জাগিয়ে আমাদেরকে গ্রেফতার করার কথা জানাবার পর আমরা প্রস্তুত হয়ে পুলিশের গাড়ীতে উঠবার প্রাক্কালে ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে মাওলানার ইমামতীতে আদায় করলাম। মাওলানা পয়লা রাকাআতে সূরা আল বুরূজ পড়লেন। "ওমা নাকামু মিনহুম ইল্লা আই ইউমিনু বিল্লাহিল আযীযিল হামীদ" পড়ার সময় মনে হলো যে আমাদের ঐ সময়কার অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার জন্যই তিনি ঐ সূরাটি বাছাই করে নিয়েছেন।

এভাবে বহু সময় অবস্থা অনুযায়ী তিনি নামাযে ঐ সব আয়াত পড়তেন যা তখনকার পরিস্থিতিতে কুরআন থেকে উপযোগী হেদায়াত গ্রহণ করা সহজ বোধ হতো।

আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সাথে

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মাওলানার প্রতি যখন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্তরে অনুভব করেছি তেমনটা আর কোন জীবিত লোকের বেলায় কখনও করিনি। আমার দাদা ও আব্বাকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং দাদী ও আম্মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। ঐ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ধরন ভিন্ন। তাদের জীবিত কালে যে স্নেহ মহব্বত ও দরদের পরিচয় পেয়েছি তা আর কোথাও পাওয়ার জিনিস নয়। সে হিসাবে তাদের সাথে কারো তুলনা চলে না।

দ্বীনের কারণে যাঁদের প্রতি পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুভব করা যায় তাঁদের মধ্যে যার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়, তিনি ঐ মহান ব্যক্তি যাকে সম্বোধন করে নামাযের মধ্যেও প্রাণভরে জানাই "আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু"

তারপর ক্রমানুযায়ী যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং পরবর্তী কালের ঐসব দ্বীনী ব্যক্তিত্ব যাদের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তাদের জীবনী, সাহিত্য ও উদাহরণ থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করেছি।

জীবিত অবস্থায় যেসব দ্বীনী মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং যাঁদের নিকট বহু কিছু শিক্ষণীয় পেয়েছি তাঁদের মধ্যে মাওলানা মওদূদী নিঃসন্দেহে আমার অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছেন। দ্বীনের যে উজ্জ্বল আলো তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এর কোন তুলনা হয় না। বিশেষ করে তাঁর তাফসীর তাফহীমুল কুরআন পড়ার সময় কখনও কখনও অন্তর থেকে তাঁর জন্য দোয়া বের হয়ে আসে। আল্লাহর কালামকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে এ তাফসীর যে অবদান রেখেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এমন এক মহান আলেমে দ্বীনের সাথে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সোহবত ও ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে বাস্তব শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য আমার অন্তরে তাঁর জন্য যে আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা আর কারো পাওনা হতে পারে না। আমার পরম স্নেহময় মুরুব্বী হিসাবে তিনি

চির অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর শান্ত সৌম্য-সুন্দর জ্যোতির্ময় চেহারা আমার চোখে আজীবন ভাসতে থাকবে।

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে আমি তাঁর সাথে লাহোরে সাক্ষাৎ করে হজ্জের উদ্দেশ্যে চলে যাবার পর থেকে ১৯৭৯ সালে তার ইন্তিকাল পর্যন্ত চিঠি পত্রের মাধ্যমেই তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত, পরামর্শ ও স্নেহমাখা উপদেশ পেতাম। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার দেশে আসার পর তাঁর কাছ থেকে যে কয়টি চিঠি পেয়েছি শুধু তাই আমার কাছে আছে। এর পূর্বে ৬ বছরে যেসব মূল্যবান চিঠি পেয়েছিলাম তা যে ব্রিফকেসে ছিলো তা চুরি হয়ে যাওয়ায় ঐ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে মাত্র তিনদিন তিনি লণ্ডন ছিলেন। আমেরিকায় তাঁর দ্বিতীয় ছেলে ডাঃ আহমদ ফারুক মওদূদীর সহায়তায় চিকিৎসা লাভ করার পর দেশে ফেরার পথে লণ্ডনে অবস্থান কালে তাঁর সাথে শেষবারের মতো আমার সাক্ষাৎ হয়। এ তিন দিন বেশী সময়ই তাঁর সান্নিধ্যে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমার নির্বাসিত জীবনের মোট ৭ বছরের মধ্যে বাধ্য হয়ে পয়লা বছরটি পাকিস্তানেই কাটিয়েছি। বাকী ৬টি বছর মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে থাকাকালে চিঠিপত্রের মাধ্যমে মাওলানার হেদায়াত সংগ্রহ করতাম এবং প্রবাসী বাংলাদেশী দ্বীনী ভাইদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতাম।

৭৪ সালে লণ্ডনে সাক্ষাতকালে মাওলানা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার জন্মভূমিতে ফিরে যাবার আশা এখনও করেন তো ? আমি বললাম, "এখনও নিরাশ হইনি।" তিনি বললেন, "তাহলে ওখানকার জন্য কাজ করে যান। দ্বীনের কাজ দুনিয়ার সব জায়গায়ই করা যায়। কিন্তু জন্মভূমির দাবী সর্বাগ্রে। যদি জন্মভূমি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যেতেন তাহলে আপনাকে আমেরিকায় হিজরত করার পরামর্শ দিতাম। ওখানে ইসলামের জন্য কাজের বিরাট ময়দান রয়েছে। বিশেষ করে কালো লোকদেরকে ইসলামের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারলে আমেরিকায় ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব।"

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন কী অবস্থায় চলছে এবং আমি কিভাবে বিদেশে কাজ করছি সে রিপোর্ট শুনে তিনি পরম স্নেহের সুরে বললেন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আমি দোয়া করছি কোন অলৌকিক উপায়ে আপনাকে দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এর ঠিক এক বছর পর শেখ মুজিব নিহত হন। তখন মনে হলো যে, কোন পথ হয়তো হয়ে যাবে।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে যে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তারা নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে পারেন। লণ্ডন থেকে আমি তাই করলাম। কোন জওয়াব পেলাম না। ৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে লিখলাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার "নাগরিকত্ব বহাল করতে অক্ষম বলে দুঃখ প্রকাশ" করে চিঠি দিলেন। আমার আম্মা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে লিখলেন, "আমার বড় ছেলেকে কেন দেশে আসতে দিচ্ছেন না ? ৭৩ সালে তার পিতা ছেলের শোক নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমিও কি মরার আগে ছেলেকে দেখে যেতে পারব না ?"

১৯৭৮ সালের মে মাসে "আমাকে ভিসা নিয়ে অল্পদিনের জন্য বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়ে" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিল। আমি মাওলানা মওদূদীকে লিখলাম "ভিসা নিয়ে দেশে যাব কিনা এবং যাবার পথে পাকিস্তান হয়ে তাঁর সাথে দেখা করে যাবার অনুমতি আছে কিনা।" তিনি দেশে যাবার এ সুযোগ গ্রহণ করার তাগীদ দিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাবার অনুমতি দিলেন না। তিনি লিখলেন, "বাংলাদেশের পাসপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি পাকিস্তানে না যাই।"

৭৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ফিরে আসার এক বছর দু' মাস পর মাওলানা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আর তাঁর সাথে দেখা হবে না এ বেদনা প্রকাশের ভাষা কোথায় ? নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে তাঁর জানাযায় শরীক হবার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত রইলাম। তাঁর একটি কথাই সান্ত্বনার উৎস হয়ে রইল যে "দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে মহান মালিক যদি উভয়কেই জান্নাতে জায়গা দেন তাহলে দেখা হতে পারে।"

□

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) অবদান

ইসলাম অবশ্যই চিরন্তন জীবনাদর্শ। আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার জন্যই যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তখনই আবার কোন নবী এসে নতুন করে শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ নবীর পর আর কোন নবী আসবেন না বলেই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যেই এমন এমন ব্যক্তি পয়দা করে এসেছেন যারা শেষ নবীর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

এসব ব্যক্তির নিকট অহী নাযিল হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ শেষ নবীর নিকট নাযিলকৃত কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত ও অবিকৃত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

সূরা আল হিজরের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○ - الحجر : ٩

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হিফাযত করবো।"

কুরআনের হিফাযতের উদ্দেশ্যেই রসূলের সুন্নতকেও হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক রসূল (সাঃ)-এর হাদীসসমূহকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণের এক জামায়াত সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা যেভাবে হারিয়ে যেতো সেভাবে শেষ নবীর আনীত ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলো অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও এর আসল মর্মকথা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহকে আসল রূপে মানব সমাজের নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত লোক পয়দা করেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ -

"আমি তোমাদের নিকট দুটো বিষয় রেখে গেলাম। আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। যদি তোমরা এ দুটোকে আকড়ে ধরে থাক তা হলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুয়াত্তা, কানযুল উম্মাল, মিশকাত)

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا-

"প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মাতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মাতের দ্বীনকে নতুন করে চালু করবেন।" (আবু দাউদ)

ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন

কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার প্রচেষ্টাকেই পুনরুজ্জীবন আন্দোলন বলে। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো "তাজদীদে দ্বীন"। যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেন তাদের বলা হয় মুজাদ্দিদ। দ্বীনের পুনরুজ্জীনের কাজ আংশিক পর্যায়েও হয়ে থাকে, সামগ্রিক আকারেও হতে পারে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামে ইবাদাতের যেসব নিয়ম রয়েছে তার সাথে যদি এমন আরও কিছু কাজ শামিল করা হয় যা রসূল (সাঃ) শিক্ষা দেননি তাহলে তা 'বিদআত' বলে গণ্য। ইবাদাতে নানা প্রকার বিদআত থেকে পাক করার চেষ্টাও একটি মূল্যবান "তাজদীদ"-এর কাজ। এভাবে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তাজদীদের কাজ হয়ে থাকে। যারা এ জাতীয় কাজ করেন তাদেরকে মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন মহান ব্যক্তি ইসলামের সব দিকেই তাজদীদের কাজ করতে সক্ষম হলে তাকেই পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে যামান (যুগের মুজাদ্দিদ) বলা হয়। ইমাম গাজ্জালী (রঃ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ), শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রঃ), শাহ ওয়াল্লিয়াউল্লাহ দেহলভী (রঃ), মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্যাব নাজদী (রঃ) নিজ নিজ যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

হিজরী চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল

বান্না শহীদ (রঃ) এবং এ উপমহাদেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) নাম মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত।

এ প্রবন্ধে শুধু মাওলানা মওদূদীর (রঃ) তাজদীদী কাজ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি ঃ

মাওলানা মওদূদীর (রঃ) বিপ্লবী চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে জামায়াতে ইসলামী নামে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে তার পক্ষ থেকে মানুষকে একমাত্র আল্লাহ ও ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হয়। কখনও মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বের দিকে কাউকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয় না। মাওলানার রচিত সাহিত্য পরিবেশন করার সময়ও ইসলামী জ্ঞানের গুরুত্বই বুঝানো হয়। মাওলানার মর্যাদা তুলে ধরার সামান্য প্রচেষ্টাও দেখা যায় না।

মাওলানার জীবদ্দশায় করাচীর দৈনিক জাসারাত পত্রিকা 'মাওলানা মওদূদী সংখ্যা' বের করার আয়োজন করছে জানতে পেরে তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য জামায়াতের করাচী শাখাকে নির্দেশ দান করেন। তাঁর জীবিত থাকাকালে তো তিনি তাঁর জন্ম দিবস পালনের অনুমতি দেনই নি, তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর জন্ম বা মৃত্যু দিবস কোথাও পালন করা হচ্ছে না। সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে কী পরিমাণ মহব্বত করে তা যারা জানে তাদের নিকট এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। এর মূল কারণ এই যে, মাওলানা মরহুমের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা নয়। এ যুগে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ভালভাবে বুঝতে হলে এবং আল্লাহর কিতাবকে ইসলামী বিপ্লবের দিশারী হিসাবে জানতে হলে মাওলানা মওদূদীর (রঃ)-এর বিপুল সাহিত্যের আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায়ই যে নেই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। ইসলামকে যারা বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চান এবং মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মানব সমাজে কায়েম করতে যারা আগ্রহী তাদের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বকে ফোকাস না করে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের যে সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য।

মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ ?

এক শ্রেণীর ওলামা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালিয়েছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদ দাবী করবেন। মাওলানা এর জওয়াবে বলেছিলেন "একমাত্র নবীর জন্যই নবুওয়াতের দাবী করা জরুরী। নবী হিসাবে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে নবুওয়াতের কাজ শুরু হতে পারে না। তাই যিনি নবী তিনি নবুওয়াতে দাবী দিয়েই কাজ শুরু করতে বাধ্য। কিন্তু মুজাদ্দিদের প্রতি ঈমান আনা জরুরী নয়। তা ছাড়া মুজাদ্দিদ আগে থেকে জানতে পারে না যে তিনি তার কাজের মাধ্যমে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হবেন কিনা। তাঁর কাজ যদি মুজাদ্দিদের মানে উত্তীর্ণ হয় তাহলে লোকেরা তাকে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করে থাকে। সুতরাং দাবী করে মুজাদ্দিদের কাজ শুরু হতে পারে না।

"আমি বার বার একথা বলা সত্ত্বেও যারা এ অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ইনশাআল্লাহ এ জাতীয় দাবী থেকে নিজেকে পাক রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব এবং আদালতে আখিরাতে আমি আমার রবের নিকট তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।"

"খোদা না করুন আমি যদি এ দাবী করেই বসি তাহলে বড়জোর একটু বড়াই করা হবে মাত্র। এ দাবী করা কোন গুনাহের কাজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি এ দাবী করবো বলে যারা প্রচার করছে তারা তো খোদায়ী দাবীই করে ফেলেছে। কারণ ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।"

আলহামদুলিল্লাহ। মাওলানা মওদূদী মুজাদ্দিদ দাবী না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন।

আমরা যারা তাঁর উদ্যোগে গঠিত ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করার কোন দায়িত্ব বোধ করি না। কারণ তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসাবে মেনে নেবার দাওয়াত আমরা দি-ই না। আর এটা কোন জরুরী বিষয়ও নয়।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে তাঁর যে অবদান, তার সঠিক মূল্যায়ণ করার যোগ্যতা যাদের আছে তাঁরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। মনীষীদের নিজ দেশে নিজ যুগের লোকেরা তাদেরকে মনীষী বলে সাধারণতঃ স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্তী কালের মানুষ তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। অবশ্য মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিদেশী অনেক ইসলামী চিন্তাবিদই উচ্চ মন্তব্য করেছেন। বিখ্যাত ইখওয়ান নেতা সিরিয়ার প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী মরহুম

ডক্টর মুস্তাফা যারকা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে অনেক আগেই মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"মাওলানা মওদূদী দ্বীনী চিন্তাধারার দিক দিয়ে ইমাম গাযযালী (রঃ) ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ)-এর সমপর্যায়ের চিন্তাবিদ।"

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যে ব্যাপক শিক্ষা তিনি পরিবেশন করেছেন তা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব অনুযায়ী ইতিহাসই বিচার করবে যে তাজদীদের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কী।

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা মাওলানা মওদূদীর জীবিতকালেও যেমন তার ব্যক্তিত্বের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেননি, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে পেশ করার কোন দায়িত্ব বোধ করেন না।

মাওলানা মওদূদীর যুগ

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯১৮ সালে বিজনোরের সাপ্তাহিক মদীনার সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

যে সময়ে তিনি কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন সে সময়টা মুসলিম জাতির চরম অধপতনের যুগ। ইসলামী আদর্শ থেকে ক্রমশঃ বিচ্যুত হবার পরিণামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপের গোলামী মুসলিম জাতিকে সর্বদিক থেকে এমন পংগু করে ফেলল যে, ওলামায়ে কেরাম কোন রকমে কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টাও চালু রাখতে সক্ষম হননি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসাবে উসমানী খেলাফত যখন খতম হয়ে গেল তখন অধঃপতনের আরও নিকৃষ্টরূপ দেখা দিল। এতদিন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতকিছু করা হয়েছে তা দুশমনদের অন্যায় আচরণ হিসাবেই মুসলামনরা বিবেচনা করেছে। তাই প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলেও ঐ সবের বিরুদ্ধে মুসলিম মানসে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার ফলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসে কোন ফাটল হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিমদের মধ্যে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেলো। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাদের মন-মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গঠিত হলো যে, নামে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা ও কর্মে তারা বিজাতীয় আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়লো। এ জাতীয় তথাকথিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে ইসলামের উপর যখন হামলা শুরু হলো তখন এর প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হতে শুরু করলো। মুসলমানদের উন্নতির দোহাই দিয়েই এসব হামলা চালানো হলো। কামাল পাশা আরবী ভাষাকে উৎখাত করে ছাড়লো। এভাবে ইসলামী সভ্যতার সব বাহ্যিক রূপ তিরোহিত করে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করাকেই উন্নতির সোপান বলে এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করে বসলো।

এ উপমহাদেশে নতুন নবুওয়াত চালু করে ইসলাম থেকে জিহাদের ধারণা লুপ্ত করার মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বকে চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র হলো। কুরআনই যথেষ্ট বলে শ্লোগান দিয়ে হাদীসকে অস্বীকার করা হলো। ওলামায়ে কেরাম এ সবের প্রতিরোধে এগিয়ে এলেও মুসলিম জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইউরোপীয় মন-মগজধারী মুসলমানদের নেতৃত্বেই চালু হয়ে রইলো।

উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নেও ওলামায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাকেই ইসলামের নামে সমর্থন জানালেন। আর একদল পৃথক মুসলিম জাতীয়তার সমর্থন করে পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হলেও আসল নেতৃত্ব ঐ সব মুসিলমদের হাতেই রইলো যারা চিন্তা ও কর্মে ইউরোপের অনুসারী।

এভাবে গোটা মুসলিম জাতি যখন ইসলামী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনই মাওলানা মওদূদী ইসলামের মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক ডামাডোলে তাঁর আওয়াজ গোটা জাতির কানে পৌঁছতে পারেনি। উপ-মহাদেশের ঐ মুসলিম জাতি বর্তমানে কয়েকটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা সব কয়টি দেশেই ইসলামকে এক বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপদান করেছে।

মাওলানার অবদান

একটি প্রবন্ধে এ যুগের ইসলামী পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। অবদানের

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না যেয়ে এক একটি পয়েন্টকে সংক্ষেপে পেশ করে তাঁর বহুমুখী অবদানের একটি তালিকাই শুধু পেশ করেছি।

এক ঃ একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপ পরিবেশন করা

মুসলিম জাতির নিকট ইসলাম কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সামাজিক রীতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী এবং জিকর ও তেলাওয়াত নিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম হিসাবে টিকে ছিলো। আর বিবাহ, তালাক, ফারায়েয ইত্যাদি সামাজিক বিধি মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের অংগ হিসাবে বেঁচে ছিল।

রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোন বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোন চর্চা ছিল না, ফিকাহর কিতাবে আদালত ও ফৌজদারী মামলার মাসলা মাসায়েল থাকলেও বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োগ না থাকায় এসব বিষয় চিন্তার রাজ্য থেকেও বিদায় নিয়েছিল।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের কোন ধারণাই সমাজে ছিল না। ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও সাধক হওয়াকেই উন্নত মানের দ্বীনদারী মনে করা হতো।

মাওলানা মওদূদী সর্বপ্রথম রেসালায়ে দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) নামক বইতে সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে পরিবেশন করার জন্য তার লেখা বই এর তালিকা বিরাট। তিনি একথাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সুশৃংখল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহ্ পাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। ইসলাম যে মানুষকে সংসার ত্যাগী বানাতে আসেনি বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবন যাপনের পথই দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত 'খুতুবাত' নামক বইতে (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বা হাকীকত সিরিজ) কুরআন ও হাদীসের দলিল দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালেমায়ে তাইয়েবা কোন ধর্মীয় মন্ত্র নয়, বরং গোটা জীবনের জন্য নীতি নির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যা দ্বারা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয়। তিনি একথাও প্রমাণ করেন যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতক ইবাদাত নয়। বরং এসব বুনিয়াদী ইবাদাত গোটা জীবনের

কর্মতৎপরতাকেই ইবাদাতে পরিণত করে। নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাতের মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ইসলামী দৃষ্টি ভংগী সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর খাঁটি গোলামের ভূমিকা যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারে।

দুই ঃ মাওলানা মওদূদীর দ্বিতীয় অবদান

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানতম ফরয একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা ঃ

আল্লাহর দ্বীন যে বাতিলের অধীনে কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল (সাঃ)-কে যে এ দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠান হায়েছিল সে কথার চর্চা ওলামা সমাজেও ছিল না। অথচ মানুষের মনগড়া আইন ও সমাজব্যবস্থা চালু থাকবে, আর তার অধীনে মুসলমানরা শুধু নামায-রোযা করার সুযোগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এমন মনোভাব আর যাই হোক সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক নয়।

অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে সে সরকার ইসলামের যতটুকু বিধান চালু থাকতে দেয় ততটুকুতে রাজী থেকে যত দ্বীনদারীই করা হোক, তা যে আল্লাহকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারে না সে কথার গুরুত্ব আলেম সমাজের মধ্যেও ছিল বলে মনে হয় না।

মুসলমানদের ঐ চরম দুর্দিনে ওলামায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে বহুভাবে দ্বীনের মূল্যবান খেদমত করেছেন। খেদমতে দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। ইংরেজের গোলামী যুগে মাদ্রাসা শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসকে হিফাজত করার যে বিরাট খেদমত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ফরীযায়ে ইকামাতে দ্বীনের কোন ধারণা এ শতকের ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল না। যদি থাকতো তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের পেছনে মুক্তাদীর ভূমিকার পরিবর্তে তাঁরা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির ইমামতের দায়িত্বই পালন করতেন।

এ দিকে বিবেচনা করলে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট মর্যাদার দাবী রাখে। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে ইকামাতে দ্বীনের আওয়াজ দিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থক না হয়ে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম যদি ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মুসলিম জাতিকে সংগঠিত করতে পারতেন তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো।

একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের মাধ্যমেই ওলামায়ে কেরাম রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন। এ দৃষ্টিভংগীর অভাবেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন।

শহীদানে বালাকোটের পর দীর্ঘকাল ইকামাতে দ্বীনের চর্চা আলেম সমাজে ও ছিল না। এ শতাব্দীতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রঃ) এক সময় এ আওয়াজ দিয়েও নিজেই থেমে যান। মাওলানা মওদূদী (রঃ) নতুন করে এ দাওয়াত পেশ করেন। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে আর কেউ এ বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে ময়দানে আসেননি।

তিন ঃ তৃতীয় অবদান

কুরআন মজীদকে ইকামাতে দ্বীনের 'গাইড'–বুক হিসাবে সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা ঃ

আল্লাহর কিতাব দুর্বোধ্য একটি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরম ভক্তির সাথে শুধু সওয়াবের নিয়তে তেলাওয়াত করার রীতিই সমাজে চালু ছিল। মাদ্রাসায় তাফসীর ক্লাসে যতটুকু আলোচনা হতো তার বাইরে জনগণের মধ্যে কুরআন বুঝবার কোন রেওয়াজই ছিল না।

আলেম সমাজের মধ্যে পর্যন্ত কুরআন বুঝবার ও বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক যেসব বিষয়ে জনগণ মাসলা-মাসায়েলের জন্য ওলামায়ে কেরামের খেদমতে হাযীর হতো সেসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফেকাহর কিতাবই শুধু চর্চ করা হতো।

দারসে কুরআনের কোন প্রচলন সাধারণভাবে ছিল না। কোন কোন মসজিদ ও মাদ্রাসায় থাকলেও খুবই অল্প সংখ্যক লোক তা থেকে উপকৃত হতো। দ্বীন শিখবার জন্য জনগণের নিকট মাসয়ালার কিতাবই একমাত্র সম্বল ছিল। আমি নিজেও বাংলা ও ইংরেজীতে যেসব অনুবাদ ও তাফসীর পাওয়া যেত তার মাধ্যমে কুরআনকে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমাকে অযোগ্য মনে করে শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে ইসলামী বই পুস্তকের সাহায্যে ইসলামকে বুঝবার পথই সহজ মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর রচিত তাফহীমুল কুরআন নামক তাফসীরের সন্ধান যখন ১৯৫৪ সালে পেলাম তখন এর বাংলা অনুবাদ হয়নি। এ তাফসীর পড়ার নেশা আমাকে উর্দু শিখতে বাধ্য করলো। যেহেতু ইতিপূর্বে কুরআন

অধ্যয়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলাম, সেহেতু তাফহীমুল কুরআনের সহজ আবেদন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো।

তাফহীমুল কুরআন যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কত বড় অবদান রেখেছে তা প্রকাশ করার পর্যাপ্ত ভাষা পাচ্ছি না। আধুনিক যুগের মন-মগজের জন্য কুরআন বুঝার সহজ পথ এতে দেখানো হয়েছে।। এ তাফসীরে একথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামী আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে। আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝবার কোন উপায় নেই।

তিনি এ তাফসীরে একথাই বুঝিয়েছেন যে, রসূল (সাঃ)-এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনই কুরআনের আসল ব্যাখ্যা। রসূল (সাঃ)-এর বিপ্লবী আন্দোলনই জীবন্ত ও বাস্তব কুরআন। যারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে না তাদের নিকট কুরআনের আসল মর্মকথা স্পষ্ট হতে পারে না। কুরআন বুঝা তাদের জন্যই সহজ, যারা ঐ আন্দোলনে সক্রিয়, যে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এ কুরআন নাযিল হয়েছে।

আজ আল্লাহর রহমতে সমাজে দারসে কুরআন ও তাফসীর মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষিত না হয়েও কুরআন বুঝবার প্রচেষ্টায় বহু লোক আত্মনিয়োগ করেছে। এখন কুরআন আর দুর্বোধ্য কিতাব নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিকট কুরআন এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাঠ্য বই। এ অবদান মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর এক অনন্য খেদমত।

চার ঃ চতুর্থ অবদান

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা ঃ

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করে এবং ইকামাতে দ্বীনের দিশারী হিসাবে কুরআন মজীদের তাফসীর করেই ক্ষান্ত হননি, রসূল (সাঃ)-এর অনুকরণে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি শুধু চিন্তাবিদের দায়িত্বই পালন করেননি, তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। নবী ও রসূলগণ ছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ অত্যন্ত দুর্লভ যিনি

সমাজ বিপ্লবের চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করে নিজেই বাস্তবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

চিন্তা ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ের ফলেই মাওলানা মওদূদী (রঃ) যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ইসলামের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়নি। আন্দোলনের ময়দানের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাধারাকে যেমন বাস্তবমুখী হতে সাহায্য করেছে, তেমনি, কুরআনের যে ব্যাখ্যা তিনি রসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবন থেকে পেয়েছেন তাই আন্দোলনে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্মে তাঁর জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।

যখন ১৯২৭ সালে তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর তখন তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ "আলজিহাদু ফিল ইসলাম" প্রকাশিত হয়। তখন তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "আল জমিয়তের" সম্পাদক। ঐ পত্রিকায়ই ধারাবাহিকভাবে তাঁর এ গবেষণার ফসল তিন বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। এ গ্রন্থের রচনা কাল ১৯২৪ থেকে ২৭ সাল পর্যন্ত। তেতাল্লিশ সালে তিনি তাফহীমুল কুরআন রচনা শুরু করে ১৯৭২ সালে সমাপ্ত করেছেন। এ ত্রিশ বছর কুরআনের যে তাফসীর লিখেছেন তাঁর সারমর্ম ঐ "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" নামক পুস্তকে কিভাবে একই দৃষ্টি-ভংগীতে রচিত হলো তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।

জিহাদের উপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কুরআনকে জিহাদেরই দিশারী হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধীর কৈফিয়তের সুরে তিনি জিহাদের ব্যাখ্যা দেননি। শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধকেই জিহাদের সংজ্ঞা হিসাবে পেশ করার যে হীনমন্যতা সেকালে এক শ্রেণীর মুসলিম নেতারা প্রদর্শন করতেন তা তিনি বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করেন। জিহাদকে তিনি ইসলামের ইতিবাচক আন্দোলন হিসাবেই পেশ করেন। মানুষের মনগড়া যেসব বিধান মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে রেখেছে তা থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করে আল্লাহর দেয়া বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নামই যে জিহাদ সে কথাই তিনি প্রমাণ করেছেন।

মানব জাতির মুক্তির এ মহান সংগ্রামের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, মানব জাতির ঐ দুশমনদেরকে ইসলামের অগ্রযাত্রার পথ থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে যদি শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের

প্রয়োজন হবেই। এ যুদ্ধকেই কুরআনের পরিভাষায় "কিতাল" বলা হয়। ইসলামী আন্দোলন হলো জিহাদ আর জিহাদেরই একটি পর্যায়ে কিতাল বা যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু জিহাদ মানেই যে কিতাল নয় সে কথা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

জিহাদ সম্পর্কে মাওলানার ঐতিহাসিক গবেষণা কালেই তিনি কুরআনের উজ্জ্বল আলোক রশ্মি লাভ করেন, যার ফলে তিনি জিহাদের বিদ্যাগত নির্লিপ্ত গবেষকের ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত হতে পারেননি। তাঁর এই গবেষণাই তাঁকে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে নিক্ষেপ করেছে।

যে কোন আন্দোলনের সাফল্য প্রধানতঃ যোগ্য নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ যুগে নূতন করে প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। রসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা অতীত ইতিহাস। এ যুগেও মানুষ সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করে দ্বীনের জন্য হাসিমুখে জান দিতে প্রস্তুত হতে পারে মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনে এরই বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে এক অজুহাতে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেবার পর তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দান করেছেন তা তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মুখলিস কর্মীদের অন্তর থেকে মৃত্যুভয়কে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ইতিসাসের উদাহরণ কর্মীদের মধ্যে ঐ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারতো না। মাওলানা মওদূদী ও ইখওয়ানের শহীদ নেতৃবৃন্দের উদাহরণ এ জযবা সৃষ্টি করেছে যে, এ যুগেও এবং আমাদের পক্ষেও দ্বীনের জন্য জীবন দেয়া সম্ভব। এ যুগে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শহীদ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুঞ্জয়ী চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন এবং মাওলানা মওদূদী (রঃ) ফাঁসির হুকুম শুনে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তা যেভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা শুধু অতীত ইতিহাসের ঘটনা দ্বারা সম্ভব ছিল না। "আমরা কি নবীর সুহবত পেয়েছি যে সাহাবীদের মতো সাহস দেখাতে পারি ?" এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা নিজেদের দুর্বলতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করার রোগ অনেকেরই আছে। তাই প্রতি যুগেই আদর্শের নমুনা প্রয়োজন। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ ও মাওলানা মওদূদী (রঃ) সে নমুনাই পেশ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর পথে মু'মিনের জান ও মালের যে কুরবানী দাবী করে তা বিনা দ্বিধায় দান করার যে আদর্শ মাওলানা কায়েম করে গেলেন তা এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট এক অবদান।

পাঁচ ঃ পঞ্চম অবদান

ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা ঃ

আল্লাহ তায়ালা মাওলানাকে শুধু ইসলামের সঠিক ধারণাই দান করেননি, ইসলাম কায়েম করার উপযোগী বিজ্ঞান সম্মত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে নিখুঁত ধারণা তাঁর কাছে পাওয়া গেছে তা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমি মনে করি। আল্লাহর কুরআন আর রসূলের হাদীস এবং চৌদ্দশ বছরের রচিত বিপুল ইসলামী সাহিত্য মন্থন করে ইসলামকে সঠিক রূপে পরিবেশন করার কাজ মাওলানা মওদূদী (রঃ) ছাড়া আরও কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ এ শতাব্দীতেই বিভিন্ন দেশে করেছেন। ইসলামের সঠিক জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য পরিবেশনার মানের দিক দিয়ে মাওলানার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা সবাই স্বীকার করেন।

কিন্তু সংগঠনের কাঠামো, সংগঠনের বিভিন্ন টায়ার কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সাংগঠনিক সমস্যা ও জটিলতা দূর করার উপায় সংগঠনকে সকল পর্যায়ে ত্রুটিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি এমন বিষয় যার মূল সূত্র কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা সম্ভব হলেও এর অনেক খুঁটিনাটি দিকের সঠিক ধারণা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীলতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কুরআন হাদীস থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করার চেয়ে নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা কম দুঃসাধ্য কাজ বলে আমার মনে হয় না।

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ইসলামের গবেষক মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদী কম বড় নয়। দেশ-বিদেশে বহু সংগঠনের অবস্থা পর্যালোচনার যে সুযোগ আমি পেয়েছি, তাতে এ ধারণাই আমার হয়েছে। সংগঠন বিভেদ ভাংগন থেকে রক্ষা করা, উপদল সৃষ্টির পথ বন্ধ করা এবং মতবিরোধ মীমাংসা করার যে নিখুঁত বিধি-বিধান তিনি দিয়ে গেছেন তার কোন তুলনা নেই। মাওলানা মওদুদীর এ সাংগঠনিক অবদান ইসলামী আন্দোলনের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।

ইসলামী সংগঠনকে সর্বাংগসুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিস্তারিত বিধি-বিধান রচনা করেছেন। এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইনি। জামায়াতে ইসলামীর জন্মলগ্ন থেকে বেশ কয়েক বছরের কার্যবিবরণীর কয়েকটি খণ্ডে যেসব সাংগঠনিক হেদায়াত রয়েছে তা বিস্ময়কর মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ। এছাড়াও কয়েকটি বইতে সংগঠনকে সর্বদিক দিয়ে উন্নততম মানে পৌঁছাবার জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ রয়েছে। ইসলামের

বাস্তব পুনরুজ্জীবন নিখুঁত সংগঠন ছাড়া সম্ভবপর নয় বলেই এ অবদানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

সংগঠনের কাঠামো এমন নিখুঁত হবার কারণেই এখানে নেতৃত্বের কোন্দল বা উপদল সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সমালোচনা ও সংশোধনের পূর্ণ সুযোগ থাকার দরুন এবং যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংগঠনের নির্ধারিত ফোরামে হওয়ার নীতি চালু থাকার ফলে এ সংগঠনে ভাংগন ধরার কোন পথই নেই। এ কারণেই এ সংগঠন কোন সময়ই দ্বিধা-বিভক্ত হয়নি।

ছয় ঃ ষষ্ঠ অবদান

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা ঃ

আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সচেতন মহলের উপযোগী গ্রহণযোগ্য ভাষায় মওদূদী (রঃ) ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী শাসনতন্ত্র, ইসলামী সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ধারণা পরিবেশন করেছেন যা অতুলনীয়। খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস থেকে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেখান থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকারী কাঠামো সম্পর্কে চিরস্থায়ী আদর্শ চয়ন করেছেন। "খিলাফত ও মুলুকিয়াত" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আদর্শ ইসলামী শাসনব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে "খিলাফত" নামে পরিচিত করেছেন। এ ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব। জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই হলো খিলাফতের ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দলের মনগড়া শাসন চালাবার কোন অধিকার নেই।

"Islamic Law and Constitution" নামক গ্রন্থে মাওলানা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে এমন ধারাবাহিক ও সিস্টেমেটিক আলোচনা করেছেন যার ফলে এই বইটিকে এ বিষয়বস্তুর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর যখন ১৯৪৮ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী জানালেন তখন পত্রিকায় তার প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রচারিত হতে লাগলো। করাচী ও লাহোরের আইনজীবীরা চ্যালেঞ্জের সুরে তাকে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করার দাওয়াত দিল। মাওলানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লাহোর বার লাইব্রেরীতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা পেশ করার পর

শাসনতন্ত্রের পণ্ডিত আইনজীবীদের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে সবাইকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

এ সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খান যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আলেমদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন তখন ১৯৫১ সালে শিয়া ওলামা সহ সকল মহলের বড় বড় ৩১ জন আলেমের এক সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে ঐ চ্যালেঞ্জের যোগ্য জওয়াব দেয়া হয়। এরপর আজ পর্যন্ত "ইসলামী শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই" এ জাতীয় মন্তব্য করার দুঃসাহস কেউ করেনি। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর অবদানই যে প্রধান একথা অস্বীকার করার সাহস কারো নেই।

চুয়াত্তর বা পঁচাত্তর সালে ইংলণ্ডের 'ফসিস' (Fosis) নামক প্রসিদ্ধ ইসলামী ছাত্র ফেডারেশন তাদের বার্ষিক সম্মেলনে "The concept of Islamic state and Govt." সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসাবে সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদীর একটি উদ্ধৃতি এখানে অত্যন্ত প্রাসংগিক হবে। উক্ত সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, "আলোচ্য বিষয়ে আরবী ও ইংরেজীতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলী আমি অধ্যয়ন করেছি। আমার গোটা আলোচনার বিষয়বস্তু একটা বইতেই চমৎকারভাবে সাজানো পেয়েছি। এ বিষয়ের জন্য এ বইটিই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। এ বইটি হলো মাওলানা মওদূদীর "Islamic Law and Constitution"

ইসলামী খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রই মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার কাঠামো সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সুযোগ আছে। ইসলামের ইতিহাসের নামে মুসলিম বাদশাহদের ইতিহাসই প্রচলিত থাকায় এ বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভংগী যাবতীয় বিভ্রান্তি অপসারণ করতে সহায়তা করেছে।

এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম জাতির ইতিহাস ও ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের নামে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে তিনি মুসলিম ইতিহাস নামে চিহ্নিত করেছেন। আর ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য মুজাহিদগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে ইতিহাসকেই তিনি ইসলামী ইতিহাস বলে গণ্য করেছেন।

তাঁর মূল যে চিন্তাধারা তাঁকে ইতিহাসের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভংগী দান করেছে তা তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, যা কুরআন ও হাদীসে আছে এবং রসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম যে নমুনা রেখে গেছেন তাই ইসলামী আদর্শ। মুসলমানরা যা করে তাই ইসলাম

নয়। সুতরাং মুসলমানরা সুদ খেলে তা ইসলামী সুদ বলে গণ্য হতে পারে না বা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেও শূকর হালাল হয়ে যায় না। এ যুক্তিতেই মুসলিম বাদশাহদের শাসনব্যবস্থা ইসলামী শাসন বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। তাঁর মতে রসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনই একমাত্র ইসলামী শাসনের আদর্শ।

সাত ঃ সপ্তম অবদান

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা ঃ

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন ও গোটা বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রচলন ও এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উত্থান মানব জাতিকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত করে রেখেছে। এ যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ে চর্চা থাকলেও ইসলামের কোন অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবী করেননি। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিম জাতির মুক্তিকামী চিন্তাবিদদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করতেন।

এ ময়দানে এ যুগে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) আগে আর কেউ সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে বস্তুবাদী নামক একই কুমাতার জঘণ্য 'দু' সন্তান' আখ্যা দিয়ে তিনি উভয় অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর মাষ্টার পীস (শ্রেষ্ঠ অবদান)।

তিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের গালভরা বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানব জাতিকে চরমভাবে শোষণ করার জন্য এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে মোক্ষম সুযোগ করে দেয়, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জগনগণকে সরকারের চিরস্থায়ী গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। পুঁজিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখলে জনগণকে আবদ্ধ করে, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের গলায় চরম রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়।

আজ সুদমুক্ত ও শোষণহীন ইসলামী অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে দুনিয়ার সর্বত্র বহু ইসলামী চিন্তাবিদ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিপুল সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে। সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংককে এখন আর অবাস্তব কল্পনা বলে বিদ্রূপ করার সাহস কারো নেই। একথার প্রতিবাদ করারও সাধ্য কারো নেই যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী (রঃ)।

আট ঃ অষ্টম অবদান

জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা ঃ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠল তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তখনকার দশকোটি মুসলমানদের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। নেতৃস্থানীয় আলেমগণও এ বিভ্রান্তির দুঃখজনক শিকার হয়ে পড়লেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামীম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) ও ইমামুল হিন্দ উপাধি ধারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (রঃ) মত দেশখ্যাত আলেমদের নেতৃত্বে আলেম সমাজের বিরাট অংশ কংগ্রেসের ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। মাওলানা মাদানীর (রঃ) 'মোত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামক মুদ্রিত বক্তৃতার প্রতিবাদে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল স্বরচিত কবিতা স্বতস্ফূর্তভাবে আবৃতি করেন। ১৯৩৮ সালে এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্বরূপ মাওলানা মওদূদী 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামী রূপ তুলে ধরেন এবং অখণ্ড ভারতের ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মতবাদ বলে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অকাট্য যুক্তি পেশ করেন।

সুখের বিষয় যে ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ), মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রঃ)-এর নেতৃত্বে আলেম সমাজের আর এক অংশ মাওলানা মাদানী (রঃ) ও মাওলানা আযাদের (রঃ) ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁরাও জাতীয়তার ইসলামী দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে তারা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এবং মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনকে অত্যন্ত সক্রিয় সমর্থন জানান। তাঁদের সমর্থন ছাড়া মুসলিম জনগণকে

কংগ্রেসের খপ্পর থেকে রক্ষা করা ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হতো না। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলনে পরিণত করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের ঐকান্তিক কামনা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হননি।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদেরকে 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' ও মুসলিম লীগ সমর্থকদেরকে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দিয়ে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে দুটো মতবাদের কোনটাই আলেম সমাজের গ্রহণযোগ্য মতাদর্শ ছিল না। জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তার সমর্থক হওয়া মুসলিম জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। আর মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পার্থিব স্বার্থই চিন্তা করেছেন। তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনাই করেননি। অবশ্য তারা মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই শুধু ইসলামের দোহাই দিয়েছিলেন।

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনই মুসলিম জাতির মুক্তির পথ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমাত কিস তারাহ কায়েম হুতী হ্যায়' নামক প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, "এটা খুবই খুশীর বিষয় যে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন না করার ফলে একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র কায়েম হলেও এ পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই কায়েম হবে না।"

ঐ বক্তৃতাটি "ইসলামী বিপ্লবের পথ" নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৫৪ সালে এ বক্তৃতাটি আমি ইংরেজীতে The Process of Islamic Revolution নামক বইতে পড়ে পাকিস্তান সরকারের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলনে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি বলেই পাকিস্তান কায়েম হবার পর ইসলামী আন্দোলনকে এখনও সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে।

নয় ঃ নবম অবদান

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা ঃ

পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভংগী মুসিলম শিক্ষিত সমাজকে এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে, মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম হীনমন্যতায় ভুগছিল। ইসলামের বহু আইন ও সমাজ বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুদকে জায়েজ করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তারা বোধ করতে লাগল। বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্যায় মনে না হলেও একাধিক বিবাহ তাদের নিকট খুবই লজ্জাজনক বোধ হলো। জিহাদের হুকুম ইসলামে থাকায় তারা কৈফিয়তের সুরে এর অপব্যাখ্যা দিতে লাগল। চুরি, জিনা, শরাব ইত্যাদির জন্য ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিকে তারা বর্বরতা মনে করতে লাগল। দাসপ্রথা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এ ব্যাপারে ইসলামের সংশোধন করার দাবী উঠলো।

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা যখন এ জাতীয় হীনমন্যতায় ভুগছিল তখন আল্লামা ইকবাল তার বলিষ্ঠ কাব্য ও যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ হীনমন্যতা দূর করার সার্থক উদ্যোগ নেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর সহজবোধ্য বিপুল সাহিত্যই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৩২ সাল থেকে মাসিক তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সমাজকে এ হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষিত মহল থেকে তাঁর নিকট আক্রমণাত্মক প্রশ্ন, সন্দেহবাদী প্রশ্ন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্নাবলী বন্যার মত আসতে থাকে। আর মাসিক পত্রিকা "রাসায়েল ও মাসায়েল" ফিচারে ঐসব প্রশ্নের অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জওয়াব তিনি দিতে থাকলেন, যা বর্তমানে ৭ খণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'তানকীহাত' নামক পাণ্ডিত্বপূর্ণ গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হবার কারণে বা ইসলামী জীবনাদর্শের পরিবর্তে অন্য কোন আদর্শে ঈমান আনার ফলে যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেও ইসলামকে বাস্তব জীবনে মেনে চলা পছন্দ করেন না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা মুসলিম পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন না, তারা আজ আর হীনমন্যতায় ভুগেন না। ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু নেই বলে ইসলামের নির্দেশ মেনে চলতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শের

প্রতি তাদের আস্থা বহাল হয়েছে। এ আস্থা বহাল করার ব্যাপারে মাওলানার অবদান যে সবচেয়ে বেশী সে কথা অনস্বীকার্য।

ইসলামের ঈমানিয়াতের বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে তিনি এমন যুক্তিপূর্ণভাবে পেশ করেছেন যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আর অন্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে নেই। মন-মস্তিষ্ক ও পূর্ণ সত্তা এখন ইসলামী ঈমানিয়াতকে গভীর প্রত্যয়ের সাথে স্বীকার করে তৃপ্তিবোধ করে। তাই ইসলামের ব্যাপারে কোন রকম হীনমন্যতা বোধ করার আর কোন অবকাশ নেই। "ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা" বইটি এ ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে।

দশ ঃ দশম অবদান

ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা ঃ

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব পরিকল্পিত হামলা চালানো হয় তার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না হলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দূরের কথা, ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে বেশ কয়েকবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

১ ১৯৫৩ সালে যখন পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আলেমদের কয়েকটি সংগঠন মুসলিম জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলল এবং প্রাদেশিক সরকারও রাজনৈতিক স্বার্থে এ পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে চাইল, তখন মাওলানা মওদূদী "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক বই লিখে এ আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করলেন। অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার অজুহাতে ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ফাঁসি দেবার যে সরকারী ষড়যন্ত্র চলছিল, তার দরুন ঐ চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

ঐ পুস্তিকায় কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদকে জনসাধারণের নিকট সহজ বোধ্য ভাষায় সুস্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে পেশ করে, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। সরকার এ পথে কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করতে চাইলে দাংগা-হাংগামার সৃষ্টিই হতো না। দাংগার সুযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারী করা হলো এবং সামরিক আদালতে এ ব্যক্তিকেই ফাঁসি দেবার রায় ঘোষণা করা হলো যিনি দাংগা-হাংগামা রোধ করার চেষ্টা করলেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো, "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক যে

বইটি রচনা করার দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করে মাওলানাকে ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো সে বইটি সামরিক আইন চলাকালেও বিলি হয়েছে এবং বইটিকে বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য পর্যন্ত মনে করা হয়নি।

কাদিয়ানী বিরোধী বহু বইই অনেকে লিখেছেন। কিন্তু মাওলানার ঐ ছোট বইটিতে কাদিয়ানীদের 'নবীর' বক্তব্য দ্বারাই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা মুসলিম উম্মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি, যারা মুসলমানদেরকেই কাফের সাব্যস্ত করে। এভাবে কাদিয়ানী ফেৎনার মুকাবিলায় মাওলানার অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

[২] জনাব গোলাম মোহাম্মদ গভর্ণর জেনারেল থাকা কালেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহমদ পারভেজ নামে এক আই, সি, এস অফিসারের নেতৃত্বে "তুলুয়ে ইসলাম" (ইসলামের আবির্ভাব) নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হাদীসকে অস্বীকার করার এক আন্দোলন রীতিমতো দানা বেঁধে উঠে। হাইকোর্টের বিচারপতি এস, এ, রহমান একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে 'তুলুয়ে ইসলামের' প্রচারিত যুক্তিগুলোর উদ্ধৃতি পর্যন্ত দিয়ে ফেললেন। এভাবে শিক্ষিত সমাজে হাদীস অস্বীকার করার 'ফিতনা' বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে লাগল।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) তাঁর মাসিক পত্রিকা তারজুমানুল কুরআনে হাদীস বিরোধী ঐ সব যুক্তির জওয়াব দেয়া শুরু করলে উক্ত বিচারপতি এর প্রতিবাদে মাওলানাকে চিঠি দেবার দুঃসাহসও করলেন। হাদীসকে ইসলামের অন্যতম উৎস মেনে নিতে অস্বীকার করার আন্দোলন যখন রীতিমতো এক ফিৎনার রূপ ধারণ করল তখন "সুন্নাত কি আইনি হাইসিয়াত" (ইসলামে হাদীসের আইনগত মর্যাদা) সম্পর্কে তারজুমানুল কুরআনের এক "বিরাট বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশ করা হয়।

উপমহাদেশের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের কোন খবর আমার জানা নেই। কিন্তু মাওলানার এ লেখাটির পর অল্পদিনের মধ্যেই "তুলুয়ে ইসলামের" অপমৃত্যু ঘটে এবং ঐ বিচারপতি তাঁর মত পরিবর্তন করার কথা ঘোষণা করে মাওলানাকে চিঠি দেন। "মাওলানার বিরুদ্ধে" যেসব মাদ্রাসায় প্রচার অভিযান চলে সেখানেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এ বইটি পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়।

[৩] ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান যখন অর্ডিন্যান্স বলে বিয়ে, তালাক ও ফারায়েযের ইসলামী বিধানকে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিবর্তন

করে দেন, তখন ১৪ জন প্রখ্যাত আলেমের নামে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর রচিত প্রতিবাদ ইসলামের পারিবারিক বিধানের প্রতিরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। অর্ডিনান্সটি এখনও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চালু রয়েছে বটে কিন্তু তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী বলে প্রমাণিত হওয়ায় মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হতে পারেনি। যারা ইসলামকে অমান্য করার প্রয়োজন মনে করে তারা অবশ্য ঐ অর্ডিনান্সটি থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে এবং আদালতও এর পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামের বিধান হিসাবে যে মর্যাদা তা কোন সময়ই ঐ অর্ডিনান্সের কিসমতে জুটবে না। মাওলানা মওদূদীর অবদানই ঐ অর্ডিনান্সটির এ দশার জন্য প্রধানত দায়ী।

[৪] ঈদুল ফিতরের দিন ধার্য করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে সরকারী মরযী চাপিয়ে দেবার কুপ্রথা রোধে মাওলানা স্থায়ী সাফল্য লাভ করেন।

সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি এলাকায় চাঁদ দেখা যাওয়ার দোহাই দিয়ে দেশের আর কোথাও চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও সরকারী সিদ্ধান্ত বলে জাতির উপর ঈদ জোর করে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৭ সালে এর বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যখন রুখে দাঁড়ালেন, তখন মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু গোটা আলেম সমাজই সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করায় মাওলানা মওদূদীকে কয়েকদিন পরই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ঐ ঘটনার পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ঐ জাতীয় সরকারী অপচেষ্টা আর হতে দেখা যায়নি।

[৫] পরিবার পরিকল্পনার নামে অভাবের দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ইসলাম সম্মত বলে চাপিয়ে দেয়ার সফল প্রতিরোধ মাওলানার এক বিরাট অবদান।

সরকারের পক্ষ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষক কতক ওলামাকে ব্যবহার করেও আজ পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণকে ইসলাম সম্মত বলে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করা সম্ভবপর হয়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা দ্বারা জন্মহার হ্রাস পাওয়ার চাইতে গর্ভপাতের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" প্রতিরোধের নামে যৌন অরাজকতার চরম বিস্ফোরণই ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ' বইটি যে চিন্তার খোরাক দিয়েছে তার ফলে গোটা আলেম সমাজ এ বিষয়ে একমতই পোষণ করে চলেছেন।

উপসংহার

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) উপরোক্ত ১০ দফা অবদান এমন সুদূর প্রসারী যে, এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসাবে পরিচয় লাভ করেছে। তাই ইসলামী বিপ্লবের ঢেউ রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক, মহিলা সহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) অবদান সর্বাধিক বলেই স্বীকৃত।

১৯৭৪ সালে লণ্ডনে মাওলানার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক বিরাট সুধী সমাবেশে বিখ্যাত ইখওয়ানী চিন্তাবিদ মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "সর্বযুগে ও সকল দেশেই ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়। এ যুগেও দুনিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। আপনারা জানেন (একটু মুচকি হেসে) আমিও কিছু চিন্তা করে থাকি। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে মাওলানা মওদূদীই শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামকে এমন সুন্দরভাবে সহজবোধ্য ভাষায় সাজিয়ে আর কেউ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি সত্যিই অতুলনীয়।" ঐ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সলীম আযযাম মাওলানাকে সম্বোধন করে বলেন, "আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের তালিকাভুক্ত কর্মীদেরকেই শুধু আপনার অনুসারী মনে করবেন না। বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে তাদের সব কর্মীই আপনাকে তাদের প্রিয় নেতা মনে করে।"

আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর আরও কয়েকটি মৌলিক অবদান রয়েছে। এক নিবন্ধে সব অবদানের আলোচনা করা সম্ভব

হলো না। কিন্তু আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ করেই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি ঃ

১ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম যে শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না, তিনি যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নেতা তারই সুস্পষ্ট চিত্র তিনি "সীরাতে সারওয়ারে আলম" নামক বিরাট গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

২ সত্যিকার মুসলিমের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা ঃ

বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদী জিন্দেগীই মুসলিম জীবন। এ জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে শুধু কতক ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে 'আল্লাহর অলী' বা 'দরবেশ' হিসাবে গড়ে উঠার প্রচলিত রেওয়াজ মুসলিম জীবনের জন্য মোটেই অনুকরণ যোগ্য নয়।

৩ ইসলামী তাসাওউফের বিশুদ্ধ পরিচয় পেশ করা ঃ

রসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাসাওউফের যে রূপ রেখে গেছেন তাই উন্নততম ইসলামী তাসাওউফ। তাসাওউফের নামে এর অতিরিক্ত যা কিছু চালু হয়েছে তা আর যাই হোক বিশুদ্ধ ইসলামী তাসাওউফ নয়। কারণ ইবাদাত, রিয়াযাত ও তাকাররোব ইলাল্লাহর যে শিক্ষা রসূল (সাঃ) দিয়ে গেছেন তা-ই পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

৪ ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তা 'পর্দা' নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর এ মর্যাদা আর কোন মতাদর্শেই দেখা যায় না।

৫ তিনি একথা যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে, অহীর জ্ঞানই শাশ্বত সত্য। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ যত উন্নত মানের জ্ঞানই পরিবেশন করুক তা অহীর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই না করে গ্রহণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ অহীর জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানই নির্ভুল বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

সমাপ্ত

অধ্যাপক গোলাম আযমের রচনাবলী

কুরআন ও সীরাত

১। আল কুরআনের সহজ অনুবাদ (সূরা আল ফাতিহা–সূরা আত তাওবা)
২। কুরআন বুঝা সহজ
৩। তাফহীমুল কুরআন (সার সংক্ষেপ) ২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০ পারা
৪। সীরাতুন্নবী সংকলন (৬টি পুস্তিকা)

মাওলানা মওদূদী

৫। মাওলানা মওদূদীকে (র) যেমন দেখেছি
৬। ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

৭। ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
৮। ইকামাতে দ্বীন
৯। ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১০। বাইয়াতের হাকীকত
১১। রুকনিয়াতের দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী

১২। জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
১৩। জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ
১৪। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
১৫। জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

বাংলাদেশ

১৬। আমার বাংলাদেশ
১৭। বাংলাদেশের রাজনীতি
১৮। পলাশী থেকে বাংলাদেশ

বিবিধ বিষয়

১৯। যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
২০। আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
২১। গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র
২২। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
২৩। বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
২৪। অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
২৫। মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
২৬। কিশোর মনে ভাবনা জাগে
২৭। প্রশ্নোত্তর

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* তাফহীমুল কুরআন(১–১৯ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* তাদাব্বুরে কুরআন (১–২ খণ্ড)
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
* শব্দে শব্দে আল কুরআন (১–১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
* সহীহ আল বুখারী (১–৬ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
* সুনান ইবনে মাজা (১–৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
* শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১–২ খণ্ড)
  –ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
* আল কুরআনের সহজ অনুবাদ
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* আমার বাংলাদেশ
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* চিন্তাধারা
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* প্রশ্নোত্তর
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* ইকামাতে দ্বীন
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* আদম সৃষ্টির হাকীকত
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* কুরআন বুঝা সহজ
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* আল্লাহর দুয়ারে ধরনা
  –অধ্যাপক গোলাম আযম